অনিল সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা

সম্পাদনা

গোপালমণি দাস

বুক ওয়ার্ল্ড
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা

ANIL SARKARER SHRESHTHA KABITA

Edited by : Dr. Gopalmani Das

প্রথম প্রকাশ

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ

আগরতলা বইমেলা, মার্চ ২০০৮

প্রকাশক

অঞ্জনা দাস

বুক ওয়ার্ল্ড

১১ জগন্নাথবাড়ি বোড

আগবতলা ৭৯৯০০১

ফোন : (০৩৮১) ২৩২ ৬৩৪২ / ২৩২ ৩৭৮১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অপরেশ পাল

মুদ্রণ

এস ডি প্রিন্টার্স

৩২এ, পটুয়াটোলা লেন কলকাতা - ৭০০ ০০৯

কলকাতার অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র

জ্ঞান বিচিত্রা

১৬ ডঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ফোন : (০৩৩) [illegible]

e-mail jnanbichitra@yahoo com

ISBN : 978-81-8266-108-0

২০০ টাকা

উৎসর্গ

সকলের জন্য

উনিশে মে

[বরাকের ভাষাশহীদদের প্রতি]

অনিল সরকার

#

দুটি নদী
ও খাল নালা
একটি নদী বরাক।
নদীর জলে
আগুন জ্বলে
নদী আগুন ছড়াক ॥

#

সেই নদীটি
মেঘনা ছিল
প্রাণ জুড়ের গান।
এই নদীটি
এপারটি
বাংলার উপাখ্যান ॥

অনিল সরকারের কবিতা

এক

সাহিত্যক্ষেত্রে অনিল সরকারের (১৯৩৯, ১ সেপ্টেম্বর) আবির্ভাব পঞ্চাশের শেষ প্রান্তে। গদ্যের কলম নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, সেই বৃত্তে আটকে থাকেননি বেশীদিন। থাকার কথাও নয়। নিম্নবিত্ত সাধারণ লোকজ পরিমণ্ডলে অতিবাহিত হয়েছে কবির কৈশোর। লেখকতার সূত্রপাত তখন থেকেই। সুতরাং, এক আকস্মিকতার ঘটনাসংঘাতে তাঁর লেখকবৃত্তির জন্ম হয়েছে, সে কথা বলা যায়না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, সময় সমারোহে আবিষ্ট জীবনের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা আর বিচিত্র ঘটনা সংঘাতই তাঁকে লেখকবৃত্তিতে টেনে এনেছে। জেদি মানসিকতা, আত্মপ্রত্যয় আর আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য পিপাসাই তাঁকে আত্মপ্রকাশের উন্মুক্ত অঙ্গনে টেনে আনে।

পিতা মহেশ সরকার ছিলেন মৎস্য ব্যবসায়ী ও গাঁয়েব মাতব্বব। ঢাকের দলেব সর্দার। গলা ছেড়ে গান গাইতেন। পুত্র অনিলও গান ভালবাসতেন। কৈশোরে যতীন্দ্র সবকারের কণ্ঠে শোনা সেই গানের সুর — 'সোনাবন্ধু হাল চাষ করে। সাগর দীঘির উত্তর পারে। লাঙলে ভেজিয়া চলে উরা। দক্ষিণা লিলুয়া বায়। সোনামুখ শুকাইয়া যায়। কারে দিয়া পাঠাইব পানগুয়া'— কবির উষ্ণ স্মৃতিতে আজো উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে আছে। এক কথায় কবি অনিল সরকারের প্রারম্ভিক পর্বটা তাঁর লেখকবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না কোনো ভাবেই। আবার তাঁর লেখকবৃত্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না তাঁর জীবনবৃত্ত থেকেও। কারণ এই লেখকতার মধ্য দিয়েই নিজেকে পরিশুদ্ধ আর সুস্থ রাখার এক অমোঘ চেতনায় সদা সঞ্জীবিত থাকেন কবি। কুমিল্লার রামমালা বোর্ডিং-এ থাকাকালীন সময়ে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র প্রিয়লাল দাসের মুখে শুনেছেন বামপন্থী আন্দোলন-সংগঠনের কথা, পাহাড়ে-পর্বতে কমিউনিস্টদের বিচরণের অভিজ্ঞতা, রোমান্টিক হিরোইজমের কথা। আর তখন থেকেই বামপন্থী চিন্তাভাবনা দানা বেঁধে যায় কিশোর অনিল সরকারের মনে। কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালা থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশের পর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে ত্রিপুরায় চলে আসেন কবি। আর তখন থেকেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি কমরেড ভানু ঘোষের কাছে। তাঁর আশ্রয়ে জীবনের মোড় যায় ঘুরে। কিশোর অনিল সরকারের হাতে ভানু ঘোষ তুলে দেন 'ছোটদের রাজনীতি' বইটি। এ যেন চাকরী নয়, দেশসেবার মন্ত্র।

মুসলিম না হলে পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতি হওয়া যায়না — এ বোধ কিশোর কবিকে দেশ ছাড়তে উৎসাহ জুগিয়ে ছিল। ত্রিপুরায় এসে নির্বান্ধব জীবনের একাকিত্ব ঘোচাবার জন্যে নেন মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষা। কমিউনিস্ট বন্ধুদের করেছেন আত্মীয়। তরুণ অনিল সরকার পেয়ে যান মাটি-মানুষ-সংস্কৃতি আর বেঁচে থাকার দর্শন। তখন থেকেই পার্টি অফিসে নিত্য আসা-যাওয়া। সদস্যপদ লাভ। কৈশোরে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সূত্রে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ আর সুকান্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। নজরুলের সাম্যচেতনা, রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতাবোধ আর

সুকান্তের সমাজ-জিজ্ঞাসা কবির চৈতন্যে দিয়েছে এক পলিমাটির উর্বরতা। মার্কসীয় দর্শন দিয়েছে দুর্লভ জীবনীশক্তি — এক ক্ষুরধার মস্তিষ্ক আর আবেগের খরস্রোত। যেন নবজন্ম লাভ করলেন কিশোর কবি অনিল সরকার। তাঁর এই নবীন স্বপ্নমাখা চোখে ভেসে ওঠে শতাব্দীর গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন নির্মম-দুঃসহ অসম্মান আর ক্ষুধার্ত আর্তনাদে বেঁচে থাকা মানুষের ছবি। মূক যারা দুঃখে সুখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সন্মুখে, কাছে থেকে দূরে যারা, অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক ক্লিষ্ট মানুষের ছবি। তাই শুরুতেই তাঁর কবিতায় অনিবার্য হয়ে উঠে সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা। খাদ্য সংকট, বেকারিত্ব, খুন, সন্ত্রাস, দাঙ্গা-রাহাজানি, গুন্ডারাজ, পুলিশী সন্ত্রাস, দমন-পীড়ন-অত্যাচার, আন্দোলন মিছিল ধর্মঘট, অপশাসন ধর্ষণ-অপহরণ, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা — এসব নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের ছবি। এরপর আর থামতে হয়নি কবিকে। অনবরত লিখে গেছেন মানুষের ' বঞ্চনার রক্তাক্ত ইতিহাস, মুখ আর মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সরীসৃপের বিষাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ছবি'। কবি হয়ে যান যোদ্ধা আর তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে খাপ-খোলা তলোয়ার। কবি জেনে গেছেন — যুদ্ধ ছাড়া ছিঁড়েনা শিকল, যুদ্ধ ছাড়া শস্যক্ষেত্র বন্দর-কারখানা আর মেহনতের নিরাপত্তা আসেনা। শব্দের ভাঁড়ামি অথবা নিরলস শব্দচর্চা — নৈঃশব্দ্য একাকিত্বের কোন গুরুত্ব নেই কবির কাছে। কবিতা সম্পর্কে তথাকথিত ধারণার তোয়াক্কা না করে কবি বলেন ঃ কবিতা আমার কাছে একটি অগ্নি পরীক্ষা। বাঘের পিঠে চড়া। একশ্রেণীর মানুষের কাছে কবিতা হলো এক রোমাঞ্চকর প্রেমের মত, নেশার মত। কিন্তু কবির কাছে কবিতা হলো জতুগৃহতুল্য, যা যাবতীয় ভেদ-বৈষম্যকে ছাই-ভস্ম করে দিতে সাহায্য করে। কবি জানেন, আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মগজে ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক এমনকি পবিত্র ব্রাহ্মণ্য রক্তধারা প্রবাহিত। এই স্ববিরোধ ধরা পড়ে আন্তরিকতায় দায়বদ্ধতায়। ফুল হয়ে যায় কাগজের ফুল। কবির যুদ্ধ এইসব বৈষম্যের বিরুদ্ধে, মুখোশের বিরুদ্ধে। আর এই যুদ্ধে কবিতাই হলো এক অমোঘ অস্ত্র। তাই কবিতা তাঁর কাছে সিংহের কেশর ছেঁড়া দুঃসাহস। জীবনীশক্তির সন্ধান। বলেছেন — কবিতা আমাকে চালু রাখে, বাঁচিয়ে রাখে। আমার কবিতা দলিত, নিম্নবর্গ নিঃস্ব আর অস্পৃশ্য মানুষের পক্ষে, অবদমিত , শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে। আমার কবিতা তাদের যুদ্ধ প্রেম ও অভ্যুত্থানে নিবেদিত। আভিজাত্যের বিরুদ্ধে ব্রাত্যজনের সংগ্রাম। আমার কবিতা কিছু পরিকল্পিত বিন্যস্ত অথবা অবিন্যস্ত এবং দায়বদ্ধ শব্দের ব্রাস ফায়ারিং। শত্রুরা এখনো আমার স্বদেশের ভোগ ও দখলের মিনারগুলো বেদখল করে আছে। যারাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, আমি তাদের সহযোদ্ধা। কবিতাই আমার কাছে অস্ত্র - নির্মম ও হিংস্র।

তাই কবি সর্বদা রণক্ষেত্রেই থাকেন। এক উন্মত্ত জেহাদে আর শব্দের অব্যর্থ আঘাতে কবিতাকে করেন অমোঘ হাতিয়ার। কবি বলেন — কবিরা এখন যোদ্ধা, কলম ক্ষিপ্র তরবারির মত। শুধু যুদ্ধের প্রস্তুতি। আর কালি শুধু রং নয়, মেহনতের প্রেমে ও ঘামে লালিত বুকে বুকে রক্তপাতের ভয়ানক দাগ। বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে বলেন — আমার হাতের শিকলটা খুলে দাও, আমি ছিঁড়ব পায়ের বেড়ি। আমরাই আজকের মহিমান্বিত মজুর, রাজদণ্ড

আমাদের শেষ উত্তরাধিকার। আমরা একদিন কেড়ে নেব রাজদণ্ড। একদিন আমরাই শাসক হবো। একদিন। যাদের ঘামে ভিজে মাটি, অঙ্কুরিত হয় রক্তবীজ, যাদের পদধ্বনি মাটিকে জাগায়, তারাই পাবে মাটির জিম্মাদারি। যাদের রক্তে শস্যের রঙ সোনা হয়, আমি তাদেরই আত্মজ, ভূমিপুত্রদের অন্ত্যজ সন্তান। আমরা একদিন শাসন করব এই দেশ। একদিন। তাই গর্বে কাঁপছে আমার চোখ। আমার বুক। ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায় চোখ রেখে বলেন —

রাজছত্র ভাঙে জানি
রক্তে ভাসে রানীর মুকুট
স্বর্ণপ্রভ শিরস্ত্রাণ
চাটে পথের কুকুর।
এত বড়ো রাজা
তার অমোঘ নির্দেশে
ভোঁতা দায়ের মতো পড়ে থাকে
আস্তাকুঁড়ে।

কালের চাকায় ঘুরে যায় দিন। বছরের পর বছর রাজা বদলায়। সাহেব বদলায়। মুখোশ বদল হয়। কিন্তু বদলায় না আমাদের মুখ। আমাদের অসুখ। বৃষ্টিহীন ললাটের অনুর্বর রেখা। কবি স্মরণ করিয়ে দেন ঃ

হে ভারবাহী মানুষেরা
তোমাদের শিশুরা রাস্তায় কাগজ কুড়ায়
হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে
তোমাদের মেয়েগুলো একগ্লাস জল খেয়ে
রাত জাগে।

অসহায় মৃত্যু কবিকে বিচলিত করে। বিদ্ধ করে কবিতার প্রাণ। রক্তস্রোতে সারি সারি শুয়ে আছে লাশ। কবির ঘুম নেই। শোকে স্তব্ধ কবিতার শ্লোক। চারিদিকে মৃত্যু আর স্বজনের লাশ। এক বোধহীন যাতনায় কবিকে করেছে গ্রাস। কবিব সুখ নেই। এক গভীর অসুখে ক্ষতাক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ঝরে পড়ে বিন্দুবিন্দু রক্তের অনুভব। এক অসহ্য যন্ত্রণায় কবিতার ফুলশয্যায় আগুন জ্বালিয়ে কবি যেন ঝুলে থাকেন হননের দড়িতে, এক মৃত্যুহীন বিজয়ের অনন্ত শিহবনে।

দুই

তাঁর কবিতা মুখ্যত মা - মাটি - মানুষের এক অশ্রুসিক্ত লবণাক্ত ছবি। কখনো দিনবদল বা কালবদলের পূর্বাভাস। সমাজবদলের প্রস্তুতি আর ঝড়ের দুরন্ত আনাগোনা। কখনো যন্ত্রণাবিদ্ধ দেশের ছবি। লক্ষ হৃদয়ের আর্তনাদ, যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন আর প্রস্তুতি। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মন্ত্রণা। খুন - সন্ত্রাস - আন্দোলন - রেলের দাবি, দাঙ্গা রাহাজানি - গুন্ডারাজ - অত্যাচার - অনাহার- মিছিল - ধর্মঘট। রাজনৈতিক ঘটনা - ধর্মীয় উন্মাদনা, বফর্স - তেহেলকা - বেস্ট বেকারী - যুদ্ধ - নির্বাচন - উৎসব - অনুষ্ঠান। আন্তর্জাতিক ঘটনা, জন্মদিন - মৃত্যুদিন, উত্তর - পূর্বাঞ্চল - আইন-কানুন। — এক উত্তাল জনজীবনের বেসামাল ছবি। উজান ময়দান (১৯৮৮), বীরচন্দ্র মনু (১৯৮৮), রক্তস্নাত নলুয়া (১৯৮৯), দামছড়া (১৯৮৯) — দেশের এইসব হাজারো ঘটনায় কলম ধরেছেন কবি। যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ের এইসব মর্মান্তিক ছবিগুলি সময়ের এক বিশ্বস্ত দলিল, ইতিহাসের নয়া ধারাপাত। একটা সময়কে, সমাজকে, একদল মানুষকে, একটা দেশকে, তার মাটি আর সংস্কৃতিকে বুঝে নিতে হলে তার কবিতার কাছে বার বার ফিরে যেতে হবে আমাদের।

কবির নিকট প্রেম আর সংগ্রাম সমার্থক। আশ্চর্য অনুভব ছাড়া আর কিছুই নয়। হৃৎপিণ্ডে শুধু একটি সূর্যের হৃদয়কে জ্বালিয়ে রাখতেই ভালবাসেন কবি। জীবনের প্রতি ভালবাসার নাম রেখেছেন যুদ্ধ। তার জন্যে অস্ত্র ধারণ করতেও কোনো বাধা নেই তাঁর। তাইতো কবির আহ্বান ঃ এসো বন্ধুরা ঢালবো রক্ত। ভালবাসার জন্যে হাঁটবো পথ। জীবনের জন্যে ধরবো আয়ুধ। প্রায়শই মনের ভেতর উঁকি দেয় ভালবাসার মুখ। কল্লোলিত মুখের মিছিলে অন্য এক মানবীর মুখ। এইসব হৃদয়ের স্মৃতি শুধু বেদনার উপাখ্যান, আর কিছুই নয়। এযেন প্রেমে আর সংগ্রামে মিলেমিশে এক আশ্চর্য অনুভব। রক্তিম শিমুল।

কিছু কবিতায় আছে শুধুই নারীর মুখ। প্রেমে আর ঘামে, ভালবাসায় আর উজ্জ্বলতায় যেন আগুনের ফুল বা ফুটন্ত সাইক্লোন। কখনোবা ঝড়ের আগুন, ঝলসানো তলোয়ার, হয়তো বা ফাগুনের দুরন্ত উচ্ছ্বাস। এইসব হাজারো মুখের মিছিলে কবি খোঁজেন এক নির্মল পুষ্পিত মুখ — বনজোৎস্নায় ফুটন্ত চাঁদমালা, রাজপথের ভিড়ে বা মিছিলে রৌদ্রস্নাত উজ্জ্বল বর্ণমালা। সেখানেই খোঁজেন কবি কবিতার নিরাপদ আশ্রয়, শিশিরের দানা। সেইসব মুখ কবিকে জাগিয়ে রাখে, সতত সুস্থ রাখে।

তিন

সমাজ জিজ্ঞাসামূলক কবিতাগুলিতেই সর্বাধিক আন্দোলিত হয়েছেন কবি। শোষণ বঞ্চনা ঘৃণা অপমান হিংসা - হিংস্রতা, বেঁচে থাকার লড়াই, মুক্তির সংগ্রাম, রাষ্ট্রীয় ব্যভিচার, আইনের ফাঁকি এইসব নিয়েই তাঁর এই পর্যায়ের কবিতাগুলি সর্বাধিক আবর্তিত হয়েছে। পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, পাশ্চাত্য আগ্রাসন আর ধর্মীয় মৌলবাদ

জোঁকের মতো প্রতিনিয়ত রক্ত শোষণ করছে আমাদের ('তিনশত্রু')। রক্তের নদী বয়ে চলছে নিরত, খুন ধর্ষণ আর নিত্য ঘানিটানা ('বদলালোনা ঘানি')। ভাতের বদলে বুলেট, জ্বলে আগুন জ্বলে দিল। চারিদিকে শুধু দিন বদলের প্রতীক্ষা ('আসছে দিন')। বুকের ভিতর সাপের ছোবল, হাড় - হাভাতের মুঠোয় যেন প্লাবনের দীর্ঘশ্বাস ('শেষ পল্টন')। ঝড় আসছে ইতিহাসের হাত ধরে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের ঘাটে, গুজরাট-পাঞ্জাবে ডেকে গেছে বান। হাজার বছর যে পাখি কেঁদেছে খাঁচায়, তার ডানায় লেগেছে আজ সমুদ্র বাতাস। বাড়ছে ব্রাত্যজনের মিছিল। বাতাসে পায়ের শব্দ। চারিদিকে আলোচনা, কানাকানি। অযথা রক্তপাত। জাগছে মহিমান্বিত মজুরের দল। ঝেড়ে ফেলছে শত শতাব্দীর দাসত্বের ধূলি। কবি শুনতে পান - ওই মহামানব আসে। দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে। কারা আসে? আমরাই আসিতেছি। বাতাসে পায়ের শব্দ। যেন সমুদ্রের ঝড়ো শিস্ ('বাতাসে পায়ের শব্দ')। চারিদিকে ষড়যন্ত্র। অবিশ্বাসের বিষাক্ত শ্বাস। বুক ভরতি ভালবাসায় হঠাৎ অবিশ্বাস। তবু বিশ্বাসে অবিচল কবি। দিন আসবে। দিন আসবেই। কবির অভয়বাণী ঃ কাঁদিসনে মা, ডরাসনে বোন, এইতো আমি আছি। সাঁতরে আঁধার যাবোই যাবো আলোর কাছাকাছি। কবির লক্ষ্য সমাজ বদল। কিন্তু সেই পথ যে অফুরান। বর্ণরূপী দৈত্য সেই পথকে আগলে রেখেছে অনন্তকাল। বাঁকে বাঁকে বিষাক্ত সরীসৃপের দীর্ঘ আস্ফালন। কবি যেন এক খরস্রোতা নদীর বিপন্ন তীরে দাঁড়িয়ে রচনা করছেন এক-একটি রক্তাক্ত অনুভব আর গভীর প্রত্যয়ের কবিতা। আর যতই লক্ষ্যে এগোচ্ছেন, নাড়া দিচ্ছেন শিকড়ে অস্তিত্বে, যেন এক ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখোশ খসে পড়ে দানবের। নির্লজ্জ আয়ুধ হাতে নির্মম ঘাতকেরা মানুষের ঝড়কে বাধা দিতে আসে। যতই এগোচ্ছেন রক্ত নদী, যেন বরফের মতো দস্যুর থাবা অনুসরণ করছে তাকে। তাই কবি সর্বদা জ্বালিয়ে রাখেন কলজেয় বাতিঘর। কবি জানেন, দাসত্ব ছাড়া হারাবার কিছুই নেই। অসম্মান ছাড়া নষ্ট হবার কীইবা আছে। তাই তো গভীর প্রত্যয়ে বলেন — যত যুদ্ধ, তত জয়। আর সেই বিশ্বাসে লিখে যাচ্ছেন অজস্র কবিতা, সময়ের কোলাজ।

চার

নব্বইয়ের দশকে এলো ঝড়। বৈশাখী তাণ্ডব। আম্বেদকরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত একটি পুস্তিকা কবিকে পাগল করে দেয়। তারো আগে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে রাখে। কবির কবিতায় আসে অনিবার্য পালাবদল। এবার যেন এক বৃহত্তর পটভূমিকায় এসে হাজির হন কবি। শুরু হয় আভিজাত্যের বিরুদ্ধে ব্রাত্যজনের সংগ্রাম। দেশজুড়ে উত্থানের টালমাটাল ছন্দ। চারিদিকে ছলোছলো ক্রোধ। রক্তনদী উথাল-পাথাল। এই সময়ের কবিতা যেন তাঁর এক-একটি ঘুমভাঙানি গান। 'হাড়ি মুচি ডোমের ছেলে, জাগোরে নতুন প্রাতে, ভাঙো পাথর, ছেঁড়ো শেকল, ঘুচাও নিজের হাতে, দুঃসহ এই রাতে' ('আম্বেদকরের প্রতি')।

এই সময়ের কবিতার মূল লক্ষ্যই হলো মানুষকে জাগিয়ে তোলা। আর সেই শক্তি কবি আগেই পেয়েছিলেন মার্কসের দর্শনে। মার্কস কবির কাছে এক ঘুম ভাঙানিয়া গান। সূর্যের মত তাঁর কবিতার সারা আকাশ যেন জুড়ে আছে মার্কস। ' আমার ঘুম ভাঙে / তার পায়ের শব্দে / জেগে দেখি বিপন্ন জন্মভূমি' ('মার্কসের প্রতি')। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় 'আরেকটি ঝড়ের নাম' — যিনি 'বর্ণভেদ শ্রেণীভেদ / পাহাড়গুলি পথে / ডিঙিয়ে যেতে নিত্য ডাকেন / ডাকেন জয় রথে' ('আম্বেদকরের প্রতি')। এই পর্বের কবিতাগুলি হলো ব্রাত্যজনের কবিতা (১৯৯৪), দলিত বাতাসে পায়ের শব্দ (১৯৯৪), আম্বেদকরের প্রতি(১৯৯৫), মার্কসের প্রতি (১৯৯৫), হীরাসিং হরিজন (১৯৯৫), আগামী শতাব্দী (১৯৯৫), শূদ্র (১৯৯৫), লালইস্তেহার (১৯৯৩), কবি যখন গুলিবিদ্ধ (১৯৯৭), আমরা আসছি, চিরায়ত পঙ্‌ক্তি নয়, সায়েনাজ খাতুন (১৯৯২) এবং পরবর্তী কালের বিখ্যাত কবিতা — ফুলনের রক্ত, দলিতরা কেন জন্মায়, বাতাসে পায়ের শব্দ, সংরক্ষণ আমার জন্মগত অধিকার প্রভৃতি কবিতা সমূহ। তারো আগে প্রকাশিত হয় 'ব্রাত্যজনের কবিতা' (১৯৯৪) কাব্যগ্রন্থ। বলা যেতে পারে ত্রিপুরায় দলিত সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত তখন থেকেই। সর্বহারা মানুষের জীবনযন্ত্রণা আর মুক্তির স্বপ্ন যেন এক নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হলো এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে। 'কালবদলের ছড়া' থেকে 'ব্রাত্যজনের কবিতা' — সময়ের ব্যবধান কমবেশি দশ বছর। শ্রেণী জিজ্ঞাসা থেকে বর্ণ জিজ্ঞাসায় ঘটে উত্তরণ। অর্থাৎ কবিতায় মূর্ত হয়ে ওঠে শ্রেণী বর্ণ আর মানবিক অধিকার বর্জিত সর্বহারা ব্রাত্য মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা। এই যন্ত্রণা বঞ্চনা বেদনা ক্রোধ ঘৃণা ও উত্থানের আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর এই সাহিত্য, তাবই নাম দলিত সাহিত্য। যা একান্তই দলিতদের জন্য, দলিত জীবনের সত্যিকারের জীবনভাষ্য। কান্না ঘাম রক্তে রঞ্জিত উপলব্ধি আর প্রতিবাদ বিদ্রোহের জীবনবেদ। যা বর্ণবাদী শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে এক শাণিত অস্ত্র। দলিত সাহিত্য তখনই হয়ে ওঠে সমাজ বিপ্লবের এক ভযানক চকমকি পাথব। বর্ণবাদেব বিলুপ্তি না ঘটলে শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়না। আঘাত হানতে হবে অসুখের গভীরে। দলিত সাহিত্য যোগাবে মনুবাদী সন্ত্রাসেব বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সাহস (দলিত সাহিত্য — একটি নবউত্থান — অনিল সরকার)। হিমালয় প্রমাণ দুইজন ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে। মার্কস ও আম্বেদকর। দলিত এবং দলিত সাহিত্যকে সাহস যোগাবে তারাই। একজন দিয়েছেন শ্রেণী শোষণ থেকে মুক্তির মন্ত্র, অন্যজন বর্ণবাদী পীড়ন থেকে। কবির উল্লেখিত কবিতাগুলির মূলসুরই হলো তাই। উক্ত কবিতাসমুহে ব্যক্ত হয়েছে ব্রাত্যজীবনের নিদারুণ যন্ত্রণা, ক্রোধ ঘৃণা বঞ্চনা বেদনা আর উত্থানের প্রতিশ্রুতি। আর এই রোমহর্ষক বীভৎস ঘৃণ্য আত্মকথাই হলো দলিত সাহিত্যের মূলসুর। আর এই জন্যই দলিত সাহিত্য স্বতন্ত্র ও বিশিষ্টতার দাবীদাব। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে তার সংসার — প্রগাঢ় আর ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধা পরস্পর — যে কোনো দেশে এবং ভাষায় রচিত হয়েও।

পাঁচ

দীর্ঘদিন যাবৎ এই অগ্রজ কবিব বিভিন্ন গ্রন্থভুক্ত এবং অগ্রন্থিত কবিতা আর কবিতার ফোল্ডার থেকে বাছাই করে একটি পরিমার্জিত ও সুনির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল আমাব। উদ্দেশ্য কবির একটি পরিশীলিত কাব্য প্রতিমা নির্মাণ করা। ব্যস্ত পাঠক প্রকৃত অর্থে কবিকে যাতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেতে পারেন, কাছে বাখতে পাবেন। আর সেই জন্যে এই কবিতা সংকলন প্রচলিত অর্থে শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন বলা যাবেনা। হয়ত তাব অন্য নাম হওয়া উচিত

ছিল। কবি তাঁর কোন কবিতাতেই দ্বিতীয়বার কলম চালাননি। এই সংকলন প্রস্তুত করার সময় সেদিকেও নজর দিতে হয়েছে।

তাঁর বহু কবিতাই সময়ানুগত্যের কারণে বহু ভাষায় অনূদিত, কখনো অভিনীত এবং সুরারোপিত হয়ে পাঠক হৃদয়ে বহুমাত্রিক আবেদন সঞ্চার করে আসছে। অধিকন্তু আবৃত্তিকারদের সহৃদয় সাহচর্য তো আছেই। আর এজন্যেই এমন একজন লোকপ্রিয় এবং বহুল চর্চিত কবির একটি সময়ানুগ সংকলন পাঠকসমাজ দীর্ঘদিন ধরেই প্রত্যাশা করে আসছে। সংকলনটি প্রস্তুত করার সময় সেইসব বিষয়ও মাথায় ছিল। উক্ত কর্মে কবির মতামতকে যথাসাধ্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধও হয়েছে ; সূক্ষ্ম বিচার - বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার সমাধানও করার চেষ্টা করেছি। বইটিতে সাম্প্রতিক কালে তোলা কবির একটি প্রতিকৃতি এবং হস্তলিপির একটি নমুনা সংযোজন করা হয়েছে।

বুক ওয়ার্ল্ড-এর কর্ণধার অঞ্জনা দাম ও দেবানন্দ দাম বইটি প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন। আমার সহধর্মিণী তৃপ্তি দাস মাঝেমধ্যে মতামত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। সংকলনটির দ্বারা পাঠক সমাজ উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। প্রত্যাশা এই টুকুই।

গোপালমণি দাস

আগরতলা
১০ জানুয়ারি, ২০০৮

সূচীপত্র

কঠিন সময়

যতই সামনে যাচ্ছি

যতই নাড়া দিচ্ছি শিকড়ে অস্তিত্বে

মুখোস খসে পড়ে, মুখ দেখি দানবের।

যতই এগুচ্ছি রক্ত নদী

শ্রেষ্ঠীদের ঘাতকেরা নির্লজ্জ আয়ুধ হাতে

মানুষের ঝড়কে বাধা দিতে চায়

তাই সেখানে রক্ত নদী ছলোছলো ক্রোধে।

যতই যাচ্ছি সূর্যের কাছাকাছি

বরফের মতো দস্যুর থাবা

আমাদের অনুসরণ করছে।

অমল রৌদ্রের মতন

এক, যে ভাষায় আমি কথা বলি
গান গাই হাসি
ফুল ফোটাই কবিতা লিখি
অথবা বিদ্রোহ করি
কিংবা আগুন জ্বেলে রাখি বুকে
যে ভাষায় আমাদের প্রথম আর্তনাদ ঝরে
সে আমার মাতৃভাষা, বাংলা
আ মরি বাংলা, তুই অনন্যা এক রানী।
যে ভাষা আক্রান্ত হলে আমিও আক্রান্ত
ক্রোধে ভাঙি দেশ, আমার মহীয়সী মায়ের জন্য
নতুন স্বদেশ গড়ি পাতি সুবর্ণ আসন
আ মরি বাংলা, তুই আমার রক্তে নদী মা।
সেজন্য ঘাতকের ছুরি সাপটে ধবি, বাঙাই হাতের তালু
কব্জি বুকের পিরান। সে ভাষাকে কেড়ে নিলে কেউ
ছটফট করি তীরবিদ্ধ বুকেব ঘায়ে।

দুই, বন্ধু, তোমার নিজেব মায়েব ভাষা তো কক্‌বরক
তোমরা যখন সে ভাষায় গান ধরো
বলো, আমাদের সন্তানকে কক্‌বরকে পড়তে দাও
হাসতে দাও, ফুল ফোটাতে দাও, তখন আমিও
তোমাদের বুকের ঘনিষ্ঠ উচ্চারণে মুগ্ধ হয়ে যাই।
যখন দেখি তোমরাই কষ্ট করে বাংলা বলো
বা তোমাদের ভাষায় কথা বলতে গিয়ে কখনো
কোনও ভদ্রলোকের পীড়ন সহ্য করে যাও
নিজ বাসভূমে পরবাসীর মতো তোমাদের সন্তান

অন্যের ভাষায় শৈশবের ছড়া নামতা বর্ণমালা
মুখস্থ করতে গিয়ে বার বার ঘামে ঘুমিয়ে পড়ে
তখন আমি চঞ্চল না হয়ে পারি না।

তিন, তোমরা সেজন্য একটা ভাষাকে মুকুলিত করতে চাও
তোমাদের মায়ের মুখে উচ্চারিত যে ভাষা কক্‌বরক
ভায়ের মুখে জন্মাবধি লালিত যে ভাষা
তোমাদের রক্তে প্রবাহিত যে ভাষা
অর্থাৎ এক মহীয়সী মাতৃভাষার নামে
যখন আন্দোলিত হও, উদ্দীপিত মুখর অরণ্যে
আনো ঝড়, বিদ্রোহ, রণজয়ের ধ্বনি
তখন আমিও বিদীর্ণ চিৎকারে বলি ঃ
আমার সহযাত্রী ভায়ের মুখ
আমার সহযাত্রী জননীর স্বর
ফুল হোক, আলো হোক
অমল রৌদ্রের মতন
বিচ্ছুরিত হোক এই পূর্ব দেশে।

ঈশ্বর সরকার

খোকা তোর কী নাম ?
চা এনে দে।

স্টলের ছেলে সে
জন্মেছিল ঈশ্বর হবার জন্য
মা রেখেছেন প্রিয় নাম ঈশ্বর সরকার।
প্রায়শই কাপ হাতে আসে
ছেঁড়া শার্ট গায়
টেবিলে টেবিলে ফেরে
ছোট ছেলে ঈশ্বর সরকার
কুঁড়ি থেকে ছিঁড়ে আনা
অপুষ্ট এক ফল।

প্রসন্ন ঘোষের ছেলে পাঠশালে যায়
প্রসন্ন ঘোষ স্টলের মালিক
ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে ঈশ্বর তাকায় ঃ
দোয়াতের কালি ফেলে সে-ও
কতদিন গাঁয়ের স্কুলে মার খেয়েছিল।

অবশেষে আকালের দিনে
চার আনায় বেচে দিয়ে শ্লেট-পেনসিল
এক পিস রুটি আর তিন গ্লাস জল গিলে
প্রসন্ন ঘোষের স্টলে এসেছে ঈশ্বর
দুইখানা প্যান্ট আর একটি পিরান
পেটভর্তি ভাত পাবে সারা বছর কাজ
কাপ ধোয়া গ্লাস মাজা চা-পরিবেশন।

তাই সে প্রসন্ন ঘোষের স্টলে
নিত্য খেটে যায়
রাত বারোটায় যবে চোখে বাড়ে নিদ
ক্ষুধাতুর শিশুর পেটে কে যেন কামড়ায়।
প্রসন্ন ঘোষের ফিস ফিস অঙ্কের হিসাব
সাপের শিসের মত কানে আসে তার
এতটুকু কাঁচা ছেলে বোঝে না এসব
বোঝে শুধু এই ভাত ভাগ করে ভরে না উদর।

এ যুগের ক্রীতদাস ঈশ্বর সরকার
স্কুল ছেড়ে স্টলবয় ভাতের কাঙাল।
তবু, কোনদিন ফাঁক পেলে ঈশ্বর সরকার
বারান্দায় কড়ি খেলে, মার্বেল পেটায়
কখনো বিসর্জনের ঢাক শুনে অস্থির বালক

ভুলে যায় চায়ের অর্ডার
হাত থেকে ফেলে দেয় স্ফটিকের জল
অথবা মাঝে মাঝে কী মুখস্থ বলে ঃ
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন!

স্বজনের মুখ

প্রায়শই শুনি, শান্তি বনে বাঘ ডেকে যায়
চোখ মেলেই প্রত্যহ সকালে দেখি, আমাদের
আবাসের কাছাকাছি হিংস্র পদচিহ্ন নখের আঁচড়
লালাসিক্ত মাটি, দ্বিতীয়ত দস্যুদের
মুখোমুখি এলে, কাছাকাছি খুব বেশি মনে পড়ে
প্রিয়জন তোমাদের মুখের অবয়ব রৌদ্রের রেখায়
ভাসমান আগুনের স্রোত। আমার ঘাড়ের কাছে,
মস্তিষ্কের কোরকে চৈতন্যের ভিতর উত্তোলিত হাত,
সারি সারি বিচ্ছুরিত তীক্ষ্ণ শররাশি ছিঁড়ে
কৌরবের অবৈধ সাম্রাজ্য।

তখন খুব বেশি আমার বুকের ভিতর তোমরা থাকো
খুব কাছাকাছি পাশে পাশে ঘনিষ্ঠ রক্তের প্রবাহে
তোমরা জেগে থাকো। স্বজনেরা অতন্দ্র সৈনিক।
তখন আমাদের শিশুরা ঘুমায় নিরুপদ্রব
আমাদের রমণীরা বলে না, ওগো বাঘ এলো, দরজা ধরো।
আমরা খোলা দরজায় ঘুমাতে চাই, অবারিত
বায়ুর সান্নিধ্যে ফোটাতে চাই রক্তিম গোলাপ
সমস্ত সহযোদ্ধা বন্ধুদের হৃৎপিণ্ডে দিতে চাই
নির্মল অক্সিজেন শস্য ও তরমুজের ঘ্রাণে লোভনীয় সব।
তবু বাঘ আসে লোকালয়ে, সিক্ত লালায় দেখি
সুবর্ণ সকাল কদর্য হয়ে আছে সামনে দু পাশে,
জল্লাদের থাবায় আমাদের বুকের আগুন আক্রান্ত
কেবল বন্ধুরা আছো বলে, যারা হাতে হাতে
বুকে বুকে প্রহরায় স্থির হয়ে আছো আমাদের
বুকের চতুর্ধারে সে আগুন নিভে না।

তবু বাঘ পড়ে হরিণের নিবিষ্ট জীবনে, জ্যোৎস্নায়
দিব্য আমলকীর ছায়ায়, আমাদের গৃহপালিত
পশুর বাথানে কিংবা গোচারণে রাখালের সুরে
ঘাতকের নির্দয় আক্রমণে আমাদের কালের রাখাল
শুয়ে পড়ে অস্থির রক্তের ফেনায়
শহিদের লাল রক্তমালা গলে।

আমার বন্ধুরা নির্দ্বিধায় যুদ্ধে যায়
আমার স্বজনেরা নির্দ্বিধায় উদ্ভাসিত মুখ,
ধনুর্বাণ লয়ে তারা প্রস্তুত সমরে
দুর্ভেদ্য চৈতন্যের বর্ম পরিহিত সহযোদ্ধা সেনাপতি সৈনিক ঃ
যুদ্ধ ছাড়া ছিঁড়ে না শিকল
যুদ্ধ ছাড়া শস্যক্ষেত্র, বন্দর, কলকারখানা ও
মেহনতের স্পষ্ট নিরাপত্তা কখনো আসে না।

তাই অরণ্যে যবে বাঘ ডাকে
ঘরের দরজায় যখন জল্লাদের করাঘাত
শৈশবের আশ্চর্য প্রতিমাকে ভাঙে
তখন
পাশাপাশি
বন্ধুদের যুদ্ধের প্রস্তুতি
তখন
অবিশ্বাস্য রক্তদানের পবিত্রতা
তখন স্থির তোমাদের লক্ষ্যভেদ
এবং রক্তের আগুনে দগ্ধ তোমাদের মুখ
আমাকে জাগিয়ে দিতে পারে
আমাকে জাগিয়ে রাখে আশ্চর্য কৌশলে।

সায়েনাজ খাতুন

আসুন বসুন
চা খাবেন ?
ডাকে সায়েনাজ খাতুন।
বয়স বারো কী তেরো
টুং টাং টুন টুন
চা বানায়
গান গায়, গুন গুন
কিশোরী কন্যা কার
সায়েনাজ খাতুন।
অঙ্ক ও হাতের লেখা
[illegible] লেখা বা দেখা
[illegible]
[illegible] গেছে ভুলে, যায়
[illegible] চা বানায়
সেঁকে পাউরুটি
চায়ের গেলাসে টুন টুন
জল তরঙ্গ রাম ধুন
বাজায় সায়েনাজ খাতুন।

চড়া রোদ কড়া খদ্দের
মিস্ত্রি কামিন মুটেরা
চোর পকেটমার লুটেরা
মৌলবি, মৌ-লোভী, সন্ত
[illegible] পুরোহিত প্রফেসার
[illegible]নের ভাঙাঘর
যেন নেই চামড়ায় ছড়,

অদূরে গাভীন
পাটনাই ছাগীটির চোখে
অদ্ভুত চাহনি,
রাত ভোরে আশ্চর্য এসব ঃ
কলকাতা টালিগঞ্জ কলকাতা
গরম চায়ের জলে গলে চিনি
স্টিমারের শব্দ আসে
কালীঘাট বাবুঘাট খিদিরপুর ডক
চিনি এসব কতদিন চিনি।

সায়েনাজ খাতুনের স্টল
বাপ ঘুমে
ছারপোকা ভরা খাট
মরা রাত কেটে যায়
কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছিল কি ?
দেশে বেদখল বাড়ি
ঘর সারি সারি
জোত জমা জমিন
[illegible] হাল গেরস্তি
মারদাঙ্গা দেশ ভাগ
লেলিহান আগুনের ত্রাস
সর্বনাশ, হে খোদা কার সর্বনাশ ?
টুং টাং টুন টুন
পাউরুটি বিস্কুট
পানবিড়ি সিগারেট চুরুট
চা বেচে সায়েনাজ খাতুন

সেখানে ছুঁয়েছে
যেখানে নুয়েছে
স্বর্গের সিঁড়ি, বল হরি বোল
খোদার আরশ আল্লাহু-আকবর
রেড রোড ইনকিলাব
ভেঙেছে ঘাতকের কিংখাব
বন্দে মাতরম
দম মারো দম
কিংবা বোম মারো বোম
ট্রাম লাইনে ট্রাফিক জ্যাম
তাই, তাড়াতাড়ি চাই চা
ফকির পাগল মাতাল
হাসপাতালের ডাক্তার
কলেজের ঊর্মিল ছাত্রী

রকবাজ ছোকরা গঞ্জিকাসেবী
কবি ও লেখক কিংবা
কমদামি চিত্রতারা
পুলিশ হাবিলদার
কালীঘাটের তীর্থযাত্রী
বড় বাজারের শেয়ার দালাল
এক সাথে চা খায়
পীর দরবেশ তান্ত্রিক হালাল।
এমন আশ্চর্য ভিড়ে চা বানায়
সায়েনাজ, কিশোরী মেয়ে
আর ভাবে —
আকাশে এখনো চাঁদ
যেন ডিঙি নাও
কারা যায় বেয়ে?

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২, কলকাতা

ভিয়েতনাম ঃ ১৯৭৫

মাগো, যে ছেলে তোর
আগুন গিলে খায়
বারুদে মাজে দাঁত
কী নাম দিবি তার ?
সে জানি কেমন ছেলে তোর
তিরিশ বছর রক্ত ঢেলে
খুনে রাঙায় নদী
বুক চিরে সে সাহস ছড়ায়
রাত পোহালে ফুলের বদল
সূর্য ছিঁড়ে আনে।

বাঘের পিঠে সোয়ার সে
কামানে পিঠ ঘষে
তার চোখের কোণে ঝড়ের মেঘ
হাতে অসি রোদে ঝলমল
তারে দেখে ডাকাত পালায়
মুকুট ঝরে
নকল রাজা ভয়ে থরো থরো।

তোর ছেলে মা, আমার ভাই
এখন মেকঙ নদীর পারে
ঝড়ে নিশান উড়িয়ে হাঁকে ঃ
রুখবি কে রে দিগ্বিজয় ?

সেই নদীর হৃদয়

সামান্য আগুনে কতটুকু দগ্ধ হয় প্রিয় ?
পোড়ে না হৃদয়,
তাই আমি হৃৎপিণ্ডে জ্বালিয়াছি
এক জ্বলন্ত সূর্যের হৃদয়
এই-ই ভালো লাগে।

তোমরা কি ভালবাসিয়াছ কেউ ?
কিংবা ভালবেসে হারায়েছো কিছু ?
ব্যাধের ঘৃণিত শরে হরিণীর হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ হলে
রক্তের প্রপাত অথবা
তার মৃত চোখে জীবনের প্রেম দেখিয়াছো ?
এক নদী কোনো জোয়ারেই কাঁপে না এখন
একদা যার সাথে
গাঁয়ের শ্যামলী মেয়ে জল নিতে এসে
করেছিল হৃদয়ের লেনদেন ইত্যাদি
— কত যুগ সে-ও আসে না।

এখন যেখানে ঘোড়া-দূর্বা বনকচু কচুরির দামে
পানখেরা জলপিপি পাখিদের ছানা খোঁজে
কিংবা ডাহুকের ডিম,
সেখানে হৃদয় ছিল, নদীর হৃদয় —
সেইখানে প্রেম ছিল মানব মানবীর,
— এক দিন গবেষণা হবে।

এইখানে নদী ছিল, নদীর হৃদয়,
হৃদয়ের নদী, যা বলো ছিল।
যার জল ছুঁয়ে কবে যুবক যুবতীরা কথা বলেছিলো

স্বচ্ছ জলে মুখ দেখে হেসেছিলো পরস্পর।
কত অমল জ্যোৎস্নার রাতে

হরিণের নিলয় খুঁজি হরিণীরা দলে দলে এসে
এখানে দাঁড়াতো প্রেমে।
সেই নদী, নদীর হৃদয়, আজ নেই
শুধু এইটুকু জেনো।

এর নাম কী ? হৃদয়ের কোন্‌খানে ঘর ?
কোনো নারী ভালবেসে যদি ডাকে,
স্মিত হাস্যে, চোখে বিশাল করুণা
কিংবা মমতার স্বর
কেন সে উচ্ছ্বসিয়া কল্লোলিয়া ফেনিল আবেগে
বিচ্ছুরিত বিকশিত হয় ?

আমি যারে ভালবাসিয়াছি
যদিও মাঝখানে হলো না মিলন
কেবল বেদনার উপাখ্যান ছাড়া,
তবুও আমার কাছে এইসব আশ্চর্য অনুভব
যেন ফোটায় রক্তিম শিমুল,
তাই আমি হৃৎপিণ্ডে জ্বেলে রাখি সূর্যের হৃদয়,
এই ভালো লাগে।

১২ মার্চ ১৯৭৬, রাত্রি ১০টা ৩০, ভেলুর কেন্দ্রীয় কারাগার

তিন শত্রু

ঘরে শত্রু বিভীষণ
বাইরে শত্রু রাম
আলোর শত্রু অন্ধকার
রাধার শত্রু শ্যাম।

দেশের শত্রু পুঁজিবাদ
শত্রু সামন্ত
বিদেশ শত্রু ইয়াংকিরা
শত্রু মহন্ত।

তিন শত্রু প্রধান শত্রু
শত্রু যেমন জোঁক
তিন শত্রু রোজ কামড়ায়
ভাই ও বোনের বুক।

রক্ত শোষে আলো শোষে
শোষে কোটি প্রাণ
তিন শত্রু খতম কর
কবুল কর জান।

তবে কেন ?

মাসি গো মাসি লংকা বাটো
ঘোমটা খুলে কোমর আঁটো
নাকের বদল নরুন দিলাম
খাজনা বাকি ঘটি নিলাম
ঘরে ঘরে মড়ক দিলাম
ভোটে নিলাম সীতা,
সোনার বঙ্গ জয় করিলাম
জ্বলুক মায়ের চিতা।।

দেশ চলে না ট্যাকসো দাও
চামড়া ছিঁড়ে ঢাক বানাও
পেট ভরে না রক্ত দাও
নকড়ি নাই চুপ করো
শত্রু কে ? দূর সরো
একটি দেশ একটি মত
হিটলারকে দণ্ডবৎ।।

দিদি গো, সেই তো মল খসালি
সেই তো লোক হাসালি
সেই তো নাচ দেখালি
ফ্যাসিবাদের খেল খেলালি
দেশটি জুড়ে খুন ঝরালি।
তবে কেন, গান্ধীবাদের ঢোল বাজালি
গণতন্ত্রের ঢাক পেটালি!!

শেষ পল্টন

উলু উলু ময়নামতী শিব যজ্ঞের ঘটা।
ছাগলে খায় যজ্ঞের ফুল গরুতে বেলপাতা।।
রাম বসলেন সিংহাসনে পাতাল গেলেন সীতা।
আহা লবকুশ বুকে তোদের ধিকি ধিকি চিতা।।

আহা লবকুশ ওরে লবকুশ রামরাজ্যে শোক।
বুকের ভিতর সাপের ছোবল বিষে মলিন মুখ।।
তোরা মুখ খোল্ রে হাত তোল্ রে থামা দারুণ কান্না।
রক্ত মেঘে ঝড়ের বাঁশি বসে থাকা আর না।।

রোদ জ্বলছে বোধ জ্বলছে সুর্যের ফুল ফোটে।
হাড়-হাভাতের মুঠোয় মুঠোয় প্লাবন জেগে ওঠে।।
জননী তোর এলোকেশে নটরাজ্যের নৃত্য।
ব্যথার নদী উথাল পাথাল গর্জে লাখো চিত্ত।।

কোলের ছাওয়াল বেচে দিলাম পরান ধরি কিসে।
বুকের ভিতর ঝড়ের নদী কালো হলো বিষে।।
নদী কালো শত্রু কালো কালো রাজার রাজ।
কালো রাজার শেষ পল্টন সাজা যুদ্ধের সাজ।।

ব্রাত্যজনের কবিতা

আমার সমস্ত শরীরে মাগো
আজন্ম বয়ে চলেছি আমার জন্মের যন্ত্রণা
তবু তুমি বার বার কেন জানি না বোঝাও
আমি নাকি রাজপুত্র, সুখী হব কোনোদিন
ফিরে পাব রাজদণ্ড, ভূমি ও বিশাল তালুক
আমি বুঝি না, শুধু বুঝি
আমার কালো চামড়ার নীচে এক লাল নদী
দুঃসহ জ্বালাবাহী ক্রন্দনের স্রোতে ভরা,
আমি বুঝি, আমার জননী দাসী কন্যা এক
আমার জন্মদাতা পিতা অনার্য চণ্ডাল ছিলেন,
জন্মাবধি ব্রাত্য আমি তাই।
কেন ?
কোনো উত্তর নাই স্বর্গীয় বিধান ছাড়া।

কত করুণার সিন্ধু শুকিয়েছে আমার জন্যে,
প্রভুদের ফুলের উদ্যানে আগাছার মতো
মৃত্তিকার উর্বর জঠরে আমার জন্ম,
ব্রাত্যজন আমি, মন্দিরে নিষিদ্ধ তৃণপুষ্প যথা।
মাগো, আমি বুঝি না তবু তুমি বলো,
আমার ললাটে নাকি রাজলেখা আছে,
আমি শুধু জানি জন্মের মুহূর্তে এই জাতকের শিরে
প্রভুদের অলৌকিক পবিত্র ঈশ্বর
রেখেছিলেন শ্রীচরণকমল দুখানি,
সেই হতে লেখা হল মোর ভাগ্যলিপি।

মাগো, তুমি শুধু বলো,
আমি নাকি একদিন রাজসূয় যজ্ঞের অশ্ব চড়ে
যাব দিগ্বিজয়ে হৃত ভূমি ও বাণিজ্য দখলে,
আমি বুঝি না, কেন বুঝি না মাগো।
শুধু ভাবি, তোর গর্ভে জন্মের যন্ত্রণা
কেন মোরে দিলি জননী,
আমৃত্যু বয়ে যাব তাই যত অসম্মান।
অথচ আমার ঘামে সোনা ফলে
ধরিত্রী উর্বরা হয়,
কলে কারখানায় চলে চাকা,
আর বিনিময়ে আমি খাই বাসি রুটি.
বকশিশ শুধু জন্মের যন্ত্রণা, আমি হীন জাত।

মাগো জন্ম যদি দিলি এই দেশে
কেন দিলি না অভিশাপ নির্বোধ হবার।
আমার চামড়ায় অভিজাত রং নেই
শিরায় অনুপস্থিত নীল রক্ত
তাই আমি আমৃত্যু হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখি
নীরব কান্নার ক্রোধ,
বংশ পরম্পরায় রেখে যাই স্বজনের জন্যে
এই সুদীর্ঘ বিষাদ,
রক্তে ও অনুভবে জড়তা ছাড়া এসব ভুলি কীভাবে ?

মাগো, কবে আমাদের রাজসূয় যজ্ঞ হবে ?
কবে আমাদের রাজ অভিষেক ?
কারা কবে হরে নিল আমাদের
গঙ্গা যমুনা পদ্মা মেঘনা
কৃষ্ণা কাবেরী সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র

সমুদ্র পর্বত নদী অবণ্য আব
দিগন্ত জড়ানো শস্য ক্ষেত্রেব দখল,
কবে লোপাট হয়েছে মা তোমার
সিন্দুকের চাবি ?

বলো কবে আমার কপালে
বক্ত চন্দন লেপে মা তুমি বলবে,
'বালক, যুদ্ধে যা-রে তুই
রণ-রক্তে লেখা আছে তোর অভিষেক'।

বলবে
'তোমার রক্তে রেখেছি আমি
জয়ের নিশানা, জননীর চিব-আশীর্বাদ,
প্রভুদেব দাস হওযা প্রভুদের জন্যে,
তোমাব জন্যে থাকুক বাজদণ্ড শুধু
যুদ্ধে যাও, যুদ্ধে যাও তুমি।'

২৯ ডিসেম্বব ১৯৯৪, কলকাতা

আম্বেদকরের প্রতি

পাহাড় যেন আকাশ ছোঁয়
বুকের ভিতর নদী
অশ্রু কানায়-কানায়,
দুঃখে বারুদ ভরে
হাঁটেন শত্রু হানায
হাঁটেন নিরবধি।।

চামড়ার রঙ কালো
যেন বিষে নীল,
চক্ষু ভরা আলো
নকল চিনেন আসল চিনেন
চিনেন মন্দ ভালো,
সারা জীবন কেঁদে গেলেন
পদানত পদাহত
তোমরা মাথা তোলো

যিশুর মতোই বিদ্ধ
রক্তে ঝরে ঘাম,
তোমার মতোই ব্রাত
স্বর্গ পাতাল মর্ত্য
কাঁপান জাহান্নাম,
কালো মাটির পলি দিয়ে
গড়েন তোমার ধাম
আকাশ জোড়া
স্বর্গ ছুঁয়ে প্রস্ফুটিত
একটি ঝড়ের নাম।।

বর্ণভেদ শ্রেণীভেদ
পাহাড়গুলি পথে,
ডিঙিয়ে যেতে নিত্য ডাকেন
ডাকেন জয়-রথে,
হাড়ি মুচি ডোমের ছেলে
জাগো রে নতুন প্রাতে,
ভাঙো পাথর ছেঁড়ো শিকল,
ঘুচাও নিজের হাতে
দুঃসহ এই রাতে।।

২ জানুয়ারি ১৯৯৫, আগরতলা

হীরা সিং হরিজন

ঐ অনন্ত আকাশে চিরকালই আছে
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
অথচ এই বালকের পূর্বপুরুষেরা কোনো কালেই
চন্দ্র কিংবা সূর্য বংশে জন্মের সাহস পায়নি,
বালক এসব জানে না, দরকারও নেই।
এই দেশে চিরকালই ছিল কিছু চেয়ার অথবা কুর্সি
বসবার মত উঁচু স্থান, উঁচু যাঁরা বসেন,
বালক দেখেছে পাঠশালে মাস্টারমশাই বসেন,
ছাত্রকে বেত্রাঘাত করে ধমকান,
কান মলে দেন কখনো।
চেয়ারে বাবুরা বসেন সাহেব বসেন
অফিসে তার বাবাকে শাসান
চোখ রাঙান, পয়সা কম দেন।
বাবা ঘরে ফিরে কাঁদেন, বউকে মারেন
দুধের শিশুকেই শালা বলে ধমকান বিনা কারণে।
বালক এসব দেখে দেখে একদিন ভাবে
আমিও চেয়ারে বসব, মাগো আমায় কুর্সি এনে দে।
মা দিয়েছেন ধমক
বাবা বলেছেন, আমরা মেথর বেটা
কুর্সিতে বসা পাপ।
বালকের মাথায় এসব ঢোকে না, কাঁদে
তাই খেলার সময় মাটির ঢিবিতে বসে
নিজেই সাহেবের মতো হাসে, হুকুম দেয়
চড় মারে ছোট বোনের গালে, যেন না কাঁদে।

সেদিন বাংলোয় বাবার সাথেই এসেছিল সে
শুনেছে, বাংলোয় এসেছেন
এক নতুন সাহেব, বড়ো মিনিস্টার
ছোট বালক এসেছিল সাহেব দেখতে
তার বাবা এসেছিল ঝাড়ু হাতে অবনত চোখ
বিনীত শরীরে দাসত্বের ছাপ,
ঘর দোর, ল্যাবেটরি, কার্পেট সাফ করে।

হীরাসিং হরিজন, বয়স ছুঁয়েছে ছয়
শৈশবের চোখে তার ঈশ্বরের ছায়া।
স্পষ্ট অস্পষ্ট কথায় যেন ফুল ঝরে
এক হাতে বাঁশরি অন্য হাতে ছিল শিশুপাঠ্য ছড়া
লাজুক মুখে তার লজ্জা টলোমলো।
বালকের ললাটে যেন
চাঁদের কপালে চাঁদ বসে আছে
অদ্ভুত কৃষ্ণাঙ্গ বালক, লোভনীয় গালে তার
এখনো চুম্বনের দাগ।

ভালে চন্দনের লেখায় মা দিয়েছেন এঁকে জয়ের তিলক,
কোনোদিনই তারা চন্দ্রসূর্যবংশে জন্মের সাহস পায়নি
অথচ কপালে তার যেন বসে আছে চাঁদ।
আমরা তো জানি, বালকের কাঙালিনী মা
কখনোই বাটি ভরা দুধ অথবা
রুই-কাতলের লোভনীয় মুড়ো দিয়ে চাঁদ কিনে
এই বালকের কপালে বসায়নি,
তবু বসে আছে চাঁদ চাঁদের কপালে আহা!

কিশোর বালক এক
হীরাসিং হরিজন নাম তার,
সূর্যবংশে জন্মে যাঁরা, এমন সাহেব দেখতে
এসেছিল, সঙ্গে তার বাবা, বাংলোর ঝাড়ুদার।

সাহেবেরা চিরদিন জন্ম নেন চন্দ্রসূর্যবংশে
তারা রাজা হন উজির নাজির সাহেব বেগম।
কাছে ডেকে বলেছিলাম, কোন্ ক্লাশে পড় ?
পড়ে টড়ে কি করবি বেটা ?
নির্দ্বিধায় বলেছিল — সাহেব হব।
কেন ?
চেয়ারে বসব।
নরম ঠোঁটে কী ভীষণ জোর!
হীরাসিং হরিজন সবেমাত্র অঙ্কুরিত বীজ
সম্ভবত রক্তে আছে প্রপিতামহের ক্রুদ্ধ পবিত্রতা
কোনো এক সম্রাটের সঙ্গীতের পরাজিত বিলাপ
না হলে এমন অবোধ বালক, এত কঠিন কথা বলে
কেন ?
এই ছোট বালক কি জানে,
তারই আত্মীয় এক জোর করে স্কুলে যেত
পড়ার সময় পেত না আসন
কারণ সে বালকও ছিল হীনজাত, ব্রাত্যজন।
তবু লেখা পড়া শিখে সেই বালক
একদিন জোর করে বসেছিলেন
রাষ্ট্রীয় চেয়ারে,
সেই বালক একদিন কালো সাহেব হলেন
কালো মানুষের প্রিয়জন বাবা সাহেব।
হীরা সিং হরিজন শোনো
আমরা তো তোমাকে চেয়ার দেবো না
তুমি
বড়ো হয়ে
জোর করে
বোসো।

৬ জানুয়ারি ১৯৯৫, করিমগঞ্জ

আগামী শতাব্দী

দরজায় কড়া নাড়ে কে ?
হুকুম।
কার ?
আমাদের।
জানলায় উঁকি মারে কে ?
ভালবাসা।
কার ?
শিশুদের।

চড়া রোদে পোড়ে কী ?
চামড়া।
কাদের ?
যারা হাত বেচে ভাত খায়
তাদের।

কী চান আপনারা ?
দখল।
কিসে ?
রুটি রুজি জমি আর
প্রেমে।
আর কী চান ?
মৃত্যু।
কার ?
আমাদের কাত করে
শিশুদের ভাত মেরে
ভাত খান যাঁরা তাঁদের।

দবজায় কড়া নাড়ে,
সময়।

রাজাদের দিন গেছে
ভজাদের ধন যাবে
স্বর্গের সিঁড়ি যাবে
বাবুদের পিঁড়ি যাবে।
দরদায় কড়া নাড়ে কে ?
ঝড়।
জন সমুদ্রের।
কেন ?
এটাই নিয়ম।

নীচেব মানুষগুলি
ওপরে উঠছে ক্রমে,
যাঁরা ছিলেন ওপরে
তাঁরা নামছেন।

দরজার কড়া নড়ে,
যাঁদের ভাল লাগছে না
সরুন
একুশ শতাব্দীকে
আসতে দিন।

দরজায় কড়া নাড়ছে কে ?
প্রলয়
আমরা আসছি।
কারা ?
ঘাম বেচে খায় যারা

কারা যায় ?
যারা জমায়।

২ জানুয়ারি ১৯৯৫, আগরতলা

শহিদ কবি

(ব্রজলাল অধিকারী স্মরণে)

আঙুল ভরা কলম ছিল
কণ্ঠ ভরা গান
মানুষ মেরে ব্যাঘ্র হলে
তার
কী হবে বিধান ?
এসব গেয়ে এ সব লিখে
গেল গলা আঙুল গেল
অমর বলিদান।

আমার ঘর তোমার বাড়ি
হাট বাজার দূরের পাড়ি
জুমের ক্ষেত ঠেলা গাড়ি
উনোন জুড়ে ভাতের হাঁড়ি
আকাশ জুড়ে লাল নিশান
ভাঙা ঘরে হাজার প্রাণ
সূর্যোদয়ের সবল গান
ব্রজলালের রক্তদান।।
এক হাতে যার দোতারা ছিল
আরেক হাতে ঝান্ডা
বুকের ভিতর কবি ছিল
পেটের ক্ষুধায় ঠান্ডা।

কবি বাঁচতে শেখায় জাগতে শেখায়
চামার কামার তাঁতির বাড়ি
বুকের ভিতর আগুন লাগায়
গ্রাম জাগে পাহাড় জাগে
শিশুর চোখে বুড়ো হাড়ে

জোয়ান বেটা জুমের চাষির
শক্ত ঘাড়ে
জীবন জাগে আগুন লাগে
তারই গানে ফাগুন লাগে।

বরফ গলাও বরফ গলাও
জমানো রাত ভাঙো
এসব গেয়ে এসব লিখে
গেল কাটা কণ্ঠনালী
আঙুল দিল রক্তডালি
শম্বুক আর একলব্য
লোককবি রক্তছবি
অমর ব্রজলাল,
রক্তে ভেজায় জয়ধ্বজা
ভোরের আকাশ লাল।

নিশান ধরো রক্ত নিশান
সূর্যোদয়ের বাজাও বিষাণ
জন্মভূমির ললাট জুড়ে
জননী তোর সিঁথিতে শান
ভয় পেয়ো না নিশান ধরো
স্বদেশ জুড়ে দুর্গ গড়ো
কণ্ঠে ধরো গান
আরো জোরে আরো জোরে
অভ্যুদয়ে ভালোবাসায়
জতুগৃহে সকল আশায়
অমর ব্রজলাল।
জাগায় মহাকাল।

১৯ জানুয়ারি ১৯৯৫, আগরতলা

চেরি হরিজন

ধনীর বাড়ির
জানলাগুলোর
গায়ে রঙিন পর্দা।
শুধু চেরির
শিশুগুলি
উলঙ্গ সর্বদা।

তামিল কবিতার অনুসরণে

শূদ্র

কার ছেলে
ভাত খায়
ভাতে মাখা দুধ লো!
কার ছেলে
জুতা মাজে
খুঁজে খায় খুদ লো ?
চামারের
কামারের
তোমাদের নয় গো,
তাই এত
রাগ কর
শূদ্রকে ভয় গো,

কারণ,
আঁধারের
রাত ভেঙে
ছিঁড়ে আনে জয় গো।।

৩ জানুয়ারি ১৯৯৫, আগরতলা

শ্রীমতী পূর্ণশ্রী ত্রিপুরা

দূরবর্তী পাহাড়ের ঘরে থাকেন
প্রপিতামহীর মতো বয়সী বুড়িমা
স্বর্ণশস্য কেটে নিলে শূন্য মাঠে
ডাঁটার মত বেআব্রু বয়স
কর্ণিকায় কার্পাসে গেঁথেছে ফুল
চোখের মণিতে তীক্ষ্ণ নজর
কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বলেছিলো
টাকা দে মন্ত্রী, ভাত খাব
ব্লাউজ তুলে দেখিয়েছেন নাভি-মণ্ডল
এক শুকনো দীঘির মতন
কড়া রোদে ফাটা ফাটা মাটি
চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে ক্ষুধা মেলেছে জিভ।
বুড়িমা কী নাম তোমার ?
— পূর্ণশ্রী ত্রিপুরা
মরা নদীর চরে ফুটে আছে
কাশ ফুল বুঝি
বাতাসের শব্দে কথা বলে হেমন্তের জ্যোৎস্না
জীর্ণ শরীরের ধ্বংসস্তূপে এখনো জাগে
তাজা মুখে ঐশ্বরিক শোভা
কোনারক কিংবা ঊনকোটির প্রস্তরিত ভাষা।
পূর্ণশ্রী ত্রিপুরার সত্তরের শরীর
যেন চৈত্রে শুকিয়েছে নদী
মৃদু শব্দে বয়ে চলে জলরেখা
তাড়ুয়া ছড়ার ক্ষীণ জলরাশি
এই ছড়াতেই জল ছিল যৌবনের মত প্রবল
রূপ ছিল রেখায় ছিল চঞ্চলতা
ভালবাসার অদ্ভুত সাহস
জ্যোৎস্না রাতে জুমের টঙে লেবাঙের নাচ
দেশি মদ টেনে পদভরে মাচাং কাঁপানো

সেদিন তার করস্পর্শে ফুটেছিল
তিল কার্পাসের ফুল
গর্ভবতী শস্যের কুসুম গন্ধ।
সেদিন বিকীর্ণ জুমের ক্ষেতে নামত চাঁদ
হরিণ হরিণীর দুর্লভ বিচরণ
শস্য ছিল সুখ ছিল দিগন্ত বিস্তৃত
জুমের ক্ষেতে পাকা ধান ছিল তরমুজ, বাঙি
লোভনীয় লাউ কুমড়ার ডগায় সবুজ বাহার
দূরে দূরে গ্রাম ও পাহাড় ছায়া ঢাকা ছিল
মাঝে মাঝে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলায় ছিল
রোদ বৃষ্টি আলো ছায়ার মদিরতা
মাঝে মাঝে দলবদ্ধ বুনো হাতি খেয়ে যেত
বাসমতী ধানের সুবাস
বিননের ভাতের গন্ধে আসে বুনো শূকর
খাসার চালের লোভনীয় ঘ্রাণে
পাহাড়ে রমণীরা কথা বলে, এখানে এসো প্রিয়।
গোয়াল ভরা গরুর বাথানে শীতে
রাতভর জ্বলে থাকে গনগন ধুনি
মাঝরাতে বাঘের গর্জন, বিড়ালের বিকট চিৎকার
ফেউ, হোলুক কিংবা অজানা পাখির ডাক।
তখন এই বুড়ি যুবতী ছিলেন
তার সারা শরীরে ছিল বনজ্যোৎস্না
মুখে ছিল চাঁদ
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছিল খাসার-চালের ভাতের নরম গন্ধ
চোখে ছিল নদী নালা ছড়ার ঝিরি ঝিরি ধ্বনি
পূর্ণশ্রী ত্রিপুরা শ্রীমতীর মত নারী ছিলেন সেদিন
আর আজ সে-ই হাত পেতেছিল
করুণ প্রার্থনায়, বাবু ভাত খাব
মন্ত্রী রাং দে
কাপড় সরিয়ে দেখিয়েছিল খালি পেট
ভাতে মরে আছে কতদিন, আহা!

একুশে ফেব্রুয়ারি

বুকের ভিতর
শোকের ভিতর
শিশুর মুখে
প্রিয়ার চোখে
একুশ আছে
একুশ আছে
আমার কাছে
তোমার কাছে।

উথাল পাথাল
ফুলের বাসে
রক্তে রঙিন
শ্যামল ঘাসে
একুশ আছে
একুশ আছে
জননী তোর
দীর্ঘ শ্বাসে।

সালাম ভাই
বরকতেরা
জব্বারেরা
বেঁচে আছে
দিগ্‌বিজয়ে
রক্তপাতে
একুশ আছে
একুশ আছে।

একুশ আছে
নদীর কূলে
তাল শিমুলে
শাপলা ফুলে
পল্লীবালার
কানের দুলে
চোখের পাতায়
নাকের ফুলে।

খোঁপায় স্তব্ধ
মেঘের কোলে
একুশ আছে
প্রাণের দোলে
একুশ আছে
ধানের ক্ষেতে
শিশুর ঘুমে
বুকের ওমে।

পাটের আঁশে
শস্য দানায়
একুশ আছে
কানায় কানায়
একুশ আছে
একুশ আছে
অন্ধরাতে
ক্রুদ্ধ হাতে।

মশাল জ্বলে
আলোর দলে
রাঙা পলাশ
কৃষ্ণচূড়ায়
জয়গানে

অভ্যুত্থানে
একুশ আছে
একুশ বাঁচে।

বৃষ্টি বাদল
ঝড়ের মাদল
মাঝিমাল্লার
মুখের আদল
জুমের ক্ষেতে
কাপাস ফুলে
তিল সরিষা
হাওয়ায় দোলে।

অমর একুশ
রমনাতেই
অমর একুশ
আজ প্রাতেই
সূর্য উঠার
আলোয় আলোয়
ঝর্নাতে
একুশ আছে
প্রলয় শিখার
প্রদীপ হাতে।

আমার ভাষা
তোমার ভাষা
সকল আশার
মাতৃভাষার
ফুলের নেশায়

ফুল ফোটে
একুশ আছে
একুশ আছে ।

আঁধার বেলায়
ভোরের পাখি
একুশ করে
ডাকাডাকি
একুশ আছে
সূর্যোদয়ে
একুশ বাঁচে
মৃত্যুভয়ে।

একুশ আছে
একুশ আছে
ফুল ফোটে
গন্ধরাজ
অগ্নিকোণে
মেঘের সাজ
একুশ আছে
জয়োদ্ধত
একুশ বাঁচে
অবিরত।

একুশ আছে
একুশ বাঁচে
রিয়াং বধূর
বুকের কাছে
কণ্ঠ মালায়
মেঘের ফাঁকে

চাঁদের ছায়ায়
হাতের ডালায়।
হজাগিরির
নাচের থালায়।
একুশ আছে
পাহাড় জুড়ে
সমতলে
হাজার ঘরে।
একুশ আছে
ফাগের দোলে
একুশ আছে
আমের বোলে

বুকের খুনে
যুদ্ধ জারি
অমর একুশ
ফেব্রুয়ারি
রক্ত জবায়
লাল ফাগুনে
ফুলের বনে
পূর্ব কোণে
জ্বলে একুশ
ফেব্রুয়ারি।
তারে কি আর
ভুলতে পারি ?

পূর্বমেঘ

তোমাদের জ্যোতির্ময় রাজবাড়ি থেকে
হে দেবগণ, আমরা বহুদূরে থাকি
এখানে স্যাঁতসেঁতে বাতাস বয়
বদ্ধ জলাশয়ে বিষাক্ত লতা গজায়
হিংস্র জলস্রোতে
দুর্গম অরণ্য পাহাড়ে
অনিচ্ছায় সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে
আলো অন্ধকারে জন্ম-মৃত্যুর ধকলে
আমরাও বেঁচে থাকি নিয়ম মাফিক
এখানে দিন আসে রাত্রির জন্য
রাত্রি আসে অন্ধকারজীবীদের স্বার্থে
ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণের আকাশ
সর্পিল চক্রান্তে ফালা ফালা হয়ে আছে
প্রতিদিন বড় হয় বঞ্চনার ক্রোধ
অগ্নিবর্ণ রক্তস্রাবী দাঁতাল পশুর মত।

আমরা ভাল নেই
আমরা সুখী নই
সাত বোন কনকচাঁপা ফুল
হবার কথা ছিল, হয়েছে কণ্টক মুকুল
গির্জার সিঁড়িতে ভাই, বোনের গলা কাটে
মন্দির-চত্বরে আশ্রিত বিভেদের তীক্ষ্ণ ছুরি
আমরা সুখী নই,
পাপে-পুণ্যে উত্থানে-পতনে
যজ্ঞে অথবা বিসর্জনে
চিরকাল রবাহূত ভিখিরি বালক
প্রার্থনায় বাহু মেলে আছি

এক আলোকিত স্বর্গ লোকের কাছে
অন্ন দাও প্রাণ দাও, নগদ প্রকল্প।
হে দেবগণ, হাজার যোজন দূর
আমাদের ব্রাত্যভূমি
ঘামে রক্তে আর্দ্র
নদ-নদী পবিত্র জলস্রোতে বিধৌত
হিমালয়ের কনিষ্ঠা দুহিতাদেব অশ্রুজলে লোনা।

পূর্বোত্তরের বিশাল আর্তনাদ
তোমাদের বর্জিত
আমাদের স্বভূমি।
তোমাদের রাজগৃহ থেকে
দীর্ঘ দূরত্বে অবস্থিত গ্রামীণ মফস্‌সম্বল আমাদেব
ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি জীর্ণ আচ্ছাদন
পাতার ছাউনি
জুমের পাহাড় ঘেঁষে নদী, নদীর কিনারে
নিষিদ্ধ বন পল্লীতেই বেআইনী জীবন
জোর করে বেঁচে আছি
বনজ্যোৎস্নায়, জলেব শব্দে
পাহাড়ী মাদলের তালে
দেশী মদেব উত্তেজনায় ভুলি
প্রতিদিন মশা মাছি জোঁক বাঘের কামড়
ভুলি মহাজন দালাল ঠগ
মধ্যস্বত্বভোগীদের নিত্য উৎপাত।
আমরা সুখী নই
রাজছত্র, ধর্ম-চক্র বানিয়া পুরোহিত
কিংবা পাদ্রী ও মৌলবীর আস্ফালনে
প্রতিদিন বুকের ভিতর ঝরে রক্ত
হাজার বছরের বিষাদ দিয়ে শয়তান
জুডাস ও দুঃশাসনেরা অস্ত্রে শান দেয়

যে অস্ত্রে সীমারেরা কাটে হাসান হোসেনের গলা
সুখে নয় দুঃখে নয় আমরা বেঁচে আছি
নির্বোধ জ্বালা ও যন্ত্রণায়।
এত দূরে আছি যে,
দেবগণ কোনোদিনই সফরে আসেননি,
দিল্লীর সম্রাট কিংবা বাদশাগণ
আমাদের কান্নার আগুন নিভাতে
পাঠাননি শীতল চাদর।
যদি বা রাজার হৃদয়ই পুড়ে ছাই হয়ে যায়
মাঝে মাঝে হাতি চড়ে এসেছেন সেনাপতি
রাজদূত, সুবেদার, তফাদার অথবা
লাঠিয়াল, রাজার সুহৃদ।
তারা কাঠ বেচে, পাচার করে গজদন্ত
গন্ডারের খড়্গ, হরিনাভি সোনা
আর সেই সোনায় নিজেদের জন্য
কিনেছেন বিলাসী ভবিষ্যৎ, ঘুমের জন্য
মেহগনি কাঠের পালঙ্ক আর বিদেশি
আতর, সুরা ও সাকির জন্যে
ঢেলেছেন রাশি রাশি মুদ্রা।

আজ কাল রাজধানীর প্রতিনিধিরা আসেন
বড় বড় সাহেব সুবা
তারা আসেন বসেন
থাকেন যান, আসেন যান
দিস্তা দিস্তা যোজনার নীল ফর্দ
নতুন কারখানা, যোগাযোগ অগ্রগতি
সেজন্য সুনির্বাচিত শব্দ মালায় স্যুভেনির
স্মরণিকা, সাংবাদিক সম্মেলন, দূরদর্শনে
ছবি, আকাশবাণীর খবর
সরকারী স্বজন [illegible] বশংবদ কথাবার্তা

আবদার আস্ফালন
তারপর অবশেষে এলো ভোট
যেন কল্পতরু উৎসব
ফলাফলে জানা যায় — আমাদের মোক্ষলাভ
কেবল মুখোশ বদল।

এভাবেই দিন যায়
পাহাড়ে পাহাড় কাঁদে
বনে কাঁদে জ্যোৎস্না
সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে
অসুখ বিসুখে চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে
কিনি আরোগ্য, যদি বা
দেখতে পারি সুখ ফিরিয়াছে ঘরে।
কোনোদিনই সুউচ্চ আসমান থেকে
ঝরেনি বৃষ্টি যা দিয়েছে উর্বরতা এখানে
এই ঘুমের পাহাড়ে ভুল করেও
আসেনি হৃদয়।

এসেছেন রাজদূত রাজবল্লভ সেনাপতি,
জায়গীরদাব, ভূস্বামী, তালুকদার
সুবেদারের বশংবদ বাজভৃত্যগণ
আজো যারা আসেন
এক পা রেখে আসেন স্বর্গের সিঁড়িতেই
এখানে শুধু এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন
এক হাতে কলম
অন্য হাতে টেলিফোন,
শুধু বলেন, সবুর করুন স্যার
সম্রাজ্ঞীর ভীষণ অসুখ
সম্রাটের চোখে ঘুম নেই!
আর মাঝে মাঝে তারা প্রচার করেন

কেন্দ্রের রাজকীয় তলব
সুদে ও আসলে কত হল
কবে দিতে হবে ফেরত, নতুবা যাবে গর্দান।

এইভাবে বছর বছর, বছরের পর বছর
আমাদের রাজা বদলান
মুখোশ বদলায়
বদলায় না আমাদের মুখ
আমাদের অসুখ
বৃষ্টিহীন ললাটের
অনুর্বর রেখা,
জুমের ক্ষেত, নদীর কিনারা পাহাড়ি ঢাল
কিংবা বন্যায় ভাসানো গ্রামের নীরে
ব্রাত্যভূমি নিদ্রাহীন বিসুখে বাঁচে
উদয়াস্ত মৃত্যু ঠেকিয়ে বুকে ও হাতে।
যাও মেঘ বলো তারে
আমাদের বুকের গুহায় লুকানো
হাজার জলহস্তীর গোঁসা
সুখ চায়, আগুন খোঁজে
খোঁজে নতুন বর্ণমালা
শব্দমালা
অগ্নিময় অক্ষরের জ্বালা।
পূবের পাহাড়ে, জুমের পাহাড়ে
দাউ দাউ লেলিহান শিখা
আমরা সুখী নই
আমরা সুখে নেই।

বিষের বাঁশি

সীতায় দিয়ে
বনবাস মা
রামকে দিলি শর্ত
ডাইনে বাঁয়ে
আঁধার কালো
মধ্যিখানে গর্ত।।

সবেমাত্র
বসতে গেছি
সোনার সিংহাসন
পেছন থেকে
ডাক দিলি তুই
বাজল বিসর্জন।।

জন্মে শত্রু
কংস মামা
বিসর্জনে কালী
ভোটে শত্রু
পঞ্চবাম
কেবল গালাগালি।।

তিন শত্রু
যুদ্ধ করে
কে পরাবে ফাঁসি।
কালের রাখাল
তেপান্তরে
বাজায় বিষের বাঁশি।।

দলছুট

দলছুট
বল ছুট
ফুট বল খেলি বে।
ভোট বল
বাক্সেতে
আয় খোকা ফেলিবে।।
দল দল
উপদল
শত দল হলি বে
জনগণ
কবে পণ
ভোটে দেবে বলি বে।।

স্বাধীনতা

তোমায় যখন
প্রথম পেলাম
ছিল মধ্যরাত।
আজো আঁধার
গভীর কালো
এলো না প্রভাত।

দিন বদলের ছড়া

দারুণ দাহে জ্বলছে বুক
কে রুখবে অশ্ব
ক্ষেত খামারে জ্বলছে ক্রোধ
আগুন আগুন শস্য।
শত্রু চেনো মিত্র চেনো
সামনে দিন রুদ্র
দীপ্ত বোধে মশাল জ্বালো
মাঝারি ও ক্ষুদ্র।
সেই মশালে অগ্নি জ্বলুক
বুকের ভিতর শিখা
জ্বলে সিন্ধু সমতট ও
কন্যা কুমারিকা!
জ্বলে অফিস ডক বন্দর
জ্বলে জাহাজ ঘাট
জ্বলে নগর জ্বলে গ্রাম
জ্বলে বাজার হাট!
শত্রু চেনো মিত্র চেনো
আসছে প্রলয় সন্ধ্যা
ওঁত পেতে ঐ কাঁটার মালা
নয় রজনীগন্ধা।
বন্ধু তোমার জয়যাত্রা
সামনে তুফান ভারী
শহিদ ভাইয়ের খুনে রাঙা
দিন বদলের পাড়ি।।

সময় ঃ ১৯৮০

দগ্ধ গৃহ জতুগৃহ

কাঁধে ভাইয়ের লাশ

বুক ভরতি ভালবাসায়

হঠাৎ অবিশ্বাস!

হাতের বাঁধন বুকের বাঁধন

বাঁধন ভীষণ শক্ত

এমন সময় বুনো চিতার

দাঁতে শিশুর রক্ত!

কাঁদিস নে মা

[illegible] নে বোন

এই তো আমি আছি,

[illegible]

[illegible]

আলোর কাছাকাছি।

দুঃসময়

আমরা খাই
বনের আলু
নালায় খুঁজি শালুক,
ভুখায় কাঁদে
কোলের শিশু
কার কাছে কই দুখ।

রেশন ঘরে
ঝোলে তালা
বাপ ঝুলেছে গাছে,
ছাওয়াল বেচি
চাল কিনলাম
বউটা যদি বাঁচে!

বৌদিমণির
গোসা দেখে
দাদায় দিলেন চড়,
ভোটে জিতলে
কথা ছিল
নামবে বাজার দর।
মন্ত্রীবাবু
দিনে ঘুমান
রাত্রে কালীপূজা,
অসুর ঘোরে
ঘরের দোরে
কাঁদেন দশভুজা।

নারীর খোঁজে
গুন্ডারা সব
হুজুর চালান গদি,
মা বোনরা
ডরে কাঁপেন
রাত না ফুরায় যদি।।

ঘুম নেই

ঘুম নেই
মন্ত্রীর
পারিষদ বর্গের
ঘাড় কেটে
ভোঁতা হল
দ্যাখো ধার খড়্গের!

ঘুম নেই
ঘুম নেই
পানশালা বোতলে,
লাশকাটা
ঘরে খোঁজ
কে গেছেন কোতলে!

ঘুম নেই
মা বোনের
বাত জাগে পাখিরা
ঘুম নেই
ঘরে ঘরে
ভয়ে কাঁপে আঁখিরা।

এলেটিন বেলেটিন

এলেটিন বেলেটিন
দিনরাত রাতদিন
যত লাগে খেয়ে নিন
তেড়ে কাটা ধিন ধিন

ভোটারের মাথাগুলো
যত লাগে কিনে নিন
ছেলেদের মাথাগুলো
যত লাগে খেয়ে নিন
ক্লাবে ক্লাবে টিভি দিন
এলেটিন বেলেটিন।

খেয়ে নিন চেয়ে নিন
বিনা কাজে বিল দিন
কিল মেরে তিন দিন
পরে নিন পরে নিন
এলেটিন বেলেটিন।

পুলিশ

পুলিশ তুমি
দেশের ছেলে
দেশ তো তোমার মা।
মায়ের শরীর
চাটে শেয়াল
তুমি জাগবে না ?
তোমার কাঁধে
বুলেট বেটন
মন্ত্রীরা খায় দোল।
ভাই দারোগা
থানাতে খুন
লাশ পায়নি ফুল।

তোমার গুলি
তোমার লাঠি
রক্ত ঝরে কার ?
তোমার দয়ায়
ডাকাত কাড়ে
ভোটের অধিকার।

পুলিশ তুমি
স্থির দাঁড়িয়ে
কার প্রহরায় রত ?
বুকের ভিতর
বিবেক তোমার
কেঁদে মরবে কত।

পুলিশ তুমি
মায়ের ছেলে
আমার সোদর ভাই,
মাথা তোল
আকাশ ফোঁড়ে
ভাঙুক দেয়ালটাই।

(সংক্ষেপিত)

চাঁদের হাট

আকাশ ভরা
সূর্য তারা
বিশ্ব ভরা হাসি,
মাঠে মাঠে
সোনালি ধান
জীবন বাশি রাশি।
বেঁচে থাকুক
দীর্ঘজীবী
স্বপ্ন আলোর দিন,
বেঁচে থাকো
ঘরে ঘরে
বসন্ত রঙিন।
যুদ্ধ নয়
আমবা চাই
ধন ধান্যে মাঠ,
যুদ্ধ নয়
শান্তি চাই
বিশ্বচাঁদেব হাট।
প্রাণ জেগেছে
বান ডেকেছে
শান্তি শপথ ক্রুদ্ধ
যুদ্ধলোভী
নিপাত যাও
আর চাই না যুদ্ধ

সাতাত্তরের স্বদেশ

মা তুই কাঁদিস কাঁদিস মাগো

মাটি অশ্রু লোনা

আকাশ গম গম বাতাস গম গম

ঝড়ের আনাগোনা।

দুধের শিশু ঝরা বকুল

সূর্য বারুদ ঠাসা

বুকে দুর্গ লক্ষ তূণে

ভিট দখলের ভাষা।

মা তুই কাঁদিস, পাঁজর ছিঁড়ে

চৌদিকেতেই লাশ

দিগন্তে লাল অগুন্তি দিন

প্রলয় পূর্বাভাস।

মা তুই কাঁদিস কাঁদিস মাগো

ও শহিদের মা

সাতাত্তরের স্বদেশ আমার

জাতক-যন্ত্রণা।

ভারত বাংলাদেশ

ওপারেতে
রাঙা মেঘ
সূর্য গেছে পাটে।
এপারেতে
সন্ধ্যা নামে
কাজলা দীঘির ঘাটে।।

ওপারেতে
শাওন ঝরে
জোড় কদমের ফুলে।
এপারেতে
মাতাল হাওয়া
বনলতায় দোলে।।

ওপার বাংলা
এপার ভারত
মধ্যে হৃদয় জোড়া।
মাথার 'পরে
নভো নীল
মধ্যে নলের বেড়া।।

ওপারে বোন
এপারে ভাই
মন যে কেমন করে।
কাঁটা তারের
খোঁচায় কত
রক্ত ঝরে পড়ে।।

এপারেতে
ফুল ফুটেছে
ওপারে কার খোঁপা ?
এপার ওপার
মালায় গাঁথা
লক্ষ কনক চাঁপা।।

ওপার পদ্মা
এপার গঙ্গা
মধ্যে করতল।
সেতু বাঁধো
মৈত্রী সেতু
প্রেমের শতদল।।

হাসমি তোমার জন্মদিনে

টক ভীষণ টক
পথে পথ-নাটক
পুলিশ এসে ফরমান দেয়
বন্ধ করুন শখ।

হল্লাবোল
বাঁধল গোল
হাসমি আবার কে ?

পুলিশকর্তা
হুকুম দিলেন
চামড়া তুলে দে।

হাট বন্ধ
ঘাট বন্ধ
বন্ধ পথের মোড়,
মন্ত্রী শুনে
রাগ করেছেন
আদেশ দিলেন জোর।

নাটক ফাটক
গান তামাশায়
করলে প্রতিবাদ
কানে ধরে
লক্ আপ নিয়ো
বুঝিয়ে দিয়ো স্বাদ।

নাট্য শিখে
ঠাট্টা করা!
পাঠিয়ে দাও জেলে,
বুঝবে তখন
জোটসরকার
কেমন বাপের ছেলে !

হাসমি তোমার
জন্মদিনে
নাটক করেছিলাম,
শুরুর আগে
পুলিশ দেখে
হেসেই মরেছিলাম !

হায়রে কপাল হায়
বাঘের চামড়া গায়,
একটা গাধা চেঁচায় খালি
এটাই প্রভুর রায় !

হাসতে মানা
কাশতে মানা
মানা নাটক পথে,
নেই কো মানা
দালালখানা
নাচলে প্রভুর মতে !

একুশের জন্যে

এপার ভারত
ওপার বাংলা
মধ্যিখানে বেড়া।
বুকের ভিতর
লক্ষ হৃদয়
আর্তনাদে ছেঁড়া।।

নলের বেড়া
ছলের বেড়া
সান্ত্রি লাখে লাখ
তোমার আকাশ
আমার আকাশ
(তবু) সন্ধ্যা তারার ঝাঁক।

একটি আকাশ
একটি চাঁদ
একটি নয়ন তারা।
তোমার বুকে
আমার বুকে
লাগিয়ে দিয়ো চারা।।

সেই চারাতে
ফুটবে কুসুম
চন্দ্র সূর্য তারা।

এপার গঙ্গা
ওপার গঙ্গা
মধ্যে প্রাণের ধারা।।

অনেক দিন
ব্যর্থ হল
রক্ত ঘোলা জলে।
ভাইকে ভাই
খুন করেছে
ধর্ম কোলাহলে।।

তোমার একুশ রক্তনদী
আমার একুশ ভাষা
মাতৃভাষা ভ্রাতৃভাষায়
ভরুক বুকের আশা।।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, কলকাতা

খবর

মাটির নীচে
লাশ পেয়েছি
যুবতী এক নাবী,
গাছের ডালে
ঝুলে ছিল
গলায় নিজেব শাড়ি!
বিয়ের বধূ
ধর্ষিতা গো
বাসবরাত্রি কালি,
উজান ময়দান
দেয ছড়িয়ে
কাব মুখেতে ছালি।
জলেব ঘাটে
লাঞ্ছিতা বোন
কোন্ গৃহিনী বধূ,
পুলিশ বলে
এসব প্রণয
প্রেম কাহিনী শুধু!!

তোমার তৃষ্ণা

তোমাব কর স্পর্শে আছে কী ভীষণ জাদু
চোখ দুটো লাজে নত
যেন সব কথা বলতে চাও
একটি [illegible]বায

বলা হয় না
নক্ষত্রের মত নড়ে চড়ে
এত কাছে তবু কত দূব সুদূব বাত্রিব
আকাশে
তোমার নাকেব ডগায যেন
ফুটে আছে ফুল
শ্রাবণেব জলে ধোযা কদম্বেব মত।

প্রতি সন্ধ্যায ছাযাময সুদূবেব গাঁয়ে
বধূরা পিদিম জ্বালে, শঙ্খ বাজায়,
হয়ত কোনো তুলসীতলে আনত নিবেদনে
তুমিও প্রার্থনা কর, শস্য চাই [illegible]
বুক ভরা ভালোবাসা।

আমরা সবাই ক্ষুধার্ত— শস[illegible]
আমরা সবাই তৃষ্ণার্ত— চাই [illegible]
এখন আমাদের প্রযোজন উ[illegible] এবং
জ্যোৎস্নার মত পবিত্র বমণীর রমণায় [illegible]
তোমাব ভালবাসা
বাঁশিব মতন ডাকে
বাঁশিব মাযাবী শব্দে বাব বার [illegible]
তাই আমি তোমাকে বাব বার চা[illegible]
দিন রাত আমাদের যাবতীয় ছন্দে[illegible]
তুমি এলে ভাল লাগে ফুল ফোটে
পাখি ডাকে
স্রোতের মতন শব্দ আসে কবিতায়

৩১ জানুযারি ১৯৯৫, আগরতলা

অপারেশন টেবিলে

মধ্যরাত্রে আকাশে
চাঁদ ছিল কিনা জানি না
নক্ষত্র ছিল আমার জন্য
অগণিত।

রাত পোহালেই আমার হৃৎপিণ্ডে
ছুরি চলবে বড়দিনের কেক কাটার মতো
আমি ঘুমাব অপারেশন টেবিলে
পুনর্জন্মের সুখে।

আমাকে যারা ভালবাসেন তাঁরা
হাসপাতালের দরজায় উদ্বিগ্ন
কাল দিয়ে গেছেন আঙুর আপেল
ডালিম ফুলের মত রাঙা রক্ত

বন্ধুরা এসেছেন আমার জীবন প্রার্থনায়
পৃথিবীর জন্য যেন বাঁচি আরো কিছুদিন।

আমি শুয়ে আছি শব্দহীন
আমার চারপাশে সশস্ত্র সার্জন
চারদিকে উদ্ভাসিত আলো
তরমুজের মত পাকা ও রসাল একটি হৃদয
কাটাকুটি হচ্ছে
আমি তখন অপারেশন টেবিলে
ঘুমে ও স্বপ্নে জড়িয়ে আছি হয়ত।
ঘুমিয়ে নিচ্ছি যত পারি
ঘুম যেন আমার কাছে
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ

ঘুম আমার কাছে শিশুদের প্রিয় মুখ
ঘুম আমার কাছে প্রেয়সীর প্রিয়তম চুম্বন

প্রতিদিন মর্গে হাসপাতালে চিতায়
দগ্ধমুখ, সহযোদ্ধাদের অকালমৃত্যু
আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে দীর্ঘকাল
অপারেশন টেবিলের রক্তস্নাত শয্যা
আমার নিরাপদ ঘুমের আশ্রয়।

ডাক্তারবাবু, আমাকে ঘুমোতে দিন
আরো একটু ঘুমোতে দিন
বন্ধুদের বলুন, ভাল আছি
রাজপুত্রের মত ঘুমোচ্ছি
একটু পরেই জাগব
তখন দেখা হবে।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, ১.৪৫ মিনিট, কলকাতা

পুনশ্চ ঃ এই কবিতাটি ড. উপেন বিশ্বাসের 'তালাশ' কাব্যগ্রন্থের উৎস প্রেরণা

অন্তস্থ

তোমার দু চোখে নদী আছে
প্রবাহিত
আমার দু চোখে তৃষ্ণা থরো থরো
তোমার দু ঠোঁটে জেগে আছে চাঁদ
সারা রাত যার চোখে ছিল না ঘুম
তোমার ওষ্ঠে জড়ানো জ্যোৎস্নার স্বাদ
লেগে আছে প্রিয়া
ক-ত-দিন এমন আপন করে দেখিনি তোমায়।

তোমার নম্র চাহনির রোদে
জ্বল জ্বল তিলখানি কালো নক্ষত্রের মতো
অথবা আলোর ক্যানভাসে
ভেসে আছে পূর্ব দেশের কোনো এক
সামুদ্রিক দ্বীপ।
তোমার আর্দ্র চাহনির সিক্ত তিলে
আমার ভালবাসাকে রাখতে দাও জমা।

তোমার হাতের তালুতে আমার জন্যে
কী আছে বলো,
স্থল পদ্ম, কিছু শিশিরের দানা
আমি চাই কবিতার জন্যে নিরাপদ
আশ্রয়
আমার জন্যে গোটা রাতভর
আশ্রিত উষ্ণতা
এবং নিরুদ্বেগ ঘুম।

৪ মার্চ ১৯৯৫, আগরতলা

খোকার স্বপ্ন

মা মাজেন
পরের বাসন
ঘরেতে নাই ভাত ।
সন্ধ্যা হলে
অন্ধকার
নিয়ে আসে রাত ।।

দুখিনী মা
প্রয়াত বাপ
প্রদীপ জ্বলে না।
তবু খোকার
উচ্চ আশা
'বড় হবো মা'।।

মাথার উপর
আপন শোভা
পায়ের তলায় মাটি ।
এমন হবো
এমন হবো
সোনার চেয়ে খাঁটি ।।

নীরমহল

এপাবে গ্রাম
ওপারে গ্রাম
মধ্যে ছলাৎ ছল
জল থৈ থৈ
রুদ্র সাগর
হাজার আঁখির জল।।

আঁখি ডাকে
পাখি ডাকে
ডাকে সাগর জল।
জলের উপর
পরীর মত
ডাকে নীরমহল।।

জলে ভাসে
জেলে ডিঙি
ভাসে বালিহাঁস।
নীল কুয়াশার
চাদর উড়ায়
ভোরেব বাতাস।।

ওপারে গ্রাম
এপারে গ্রাম
সূর্য গেছে পাটে।
বিদায় ভানু
সোনার থালায়
নিত্য ডোবে ঘাটে।।

রাজঘাট
বাজার হাট
সূর্য ডোবা সন্ধ্যা।
বুকেব ভিতব
ফুটিযে দেয
লক্ষ রজনীগন্ধা।।

নীরমহল
জল মহল
জলের কথামালা।
শব্দ আলোয়
রূপ কথায়
জীবনযৌবন ঢালা।।

বাঘ

ফোটে নি চাঁদ
ফোটেনি ফুল
গা ছমছম রাত !
বুনো বাঘে
কামড়ে নিল
সোনামণির হাত !!

পাহাড়ে বাঘ
শহরে বাঘ
মধ্যে মানুষ ভীত !
মায়ের কোলে
শিশুর লাশ
আকাশে চাঁদ মৃত !!

ডরে কাঁপে
চন্দ্র সূর্য
ডরে কাঁদে তারা
খোকন খোকন
কত ডাকলাম
কেউ দিল না সাড়া !!

ঝরা বকুল
মরা জ্যোৎস্না
আঁধার মেঘে বৃষ্টি !
বাটি ভরা রক্ত দিলাম
বাঘের জন্যি ফিষ্টি!!

পার্বতী

মুখের হাসি
নদীর মত
নদীর জলে ঢেউ।
ফুলের মত
ফোটে হাসি
যদি দেখে কেউ।।

বাঁশির মত
নাকটি মেয়ের
খোঁপায় গাঁদা ফুল।
বাসন মাজে
নিত্য কাজে
মেঘবরন চুল।।

বকলে হাসে
দেখলে হাসে
যেন হীরা পান্না।
বুকের ভিতর
লুকিয়ে রাখে
দিন রাত্রির কান্না।।

নাতিনমনু পুতিনমনু

নাতিনমনু পুতিনমনু
মধ্যিখানে ঘর
সেই ঘরেতে বসত করেন
দাদন রাজার চর।

এক পয়সার নুন দিলাম
তিন পয়সার ধান
কেমন পশু মহাজন রে
রক্ত করে পান !

জমিন খায় জিরেত খায়
মনুষ্যি নয় বাঘ
ঘুমোস নে বোন ঘুমোস নে ভাই
অতন্দ্র রাত জাগ্।

নাতিনমনু পুতিনমনু
মধ্যিখানে কে ?
সোদর ভাই জন্ম নিল
ব্যাঘ্র মারিতে ।।

কেয়া

বুকের ভিতর
নদী আছে
নদীর আছে খেয়া
আকাশ জুড়ে
মেঘ মল্লার
বৃষ্টি মুখর দেয়া।।

দুই পারেতে
ভরা ভাদর
টাপুর টুপুর বৃষ্টি
নদীর চরে
কেয়া বন
ফুলের গন্ধে মিষ্টি।।

বুকের কাছে
নদী আছে
নদীর আছে খেয়া।
সেই খেয়াতে
নিত্য ভাসে
একটি মেয়ে কেয়া।।

হজাগিরি

রিয়াঙের
মেয়েগুলি
চঞ্চল পাখি লো।
ঢেউ তোলা
বনমালা চঞ্চল আঁখি লো।।
ছন্দেতে
দোলে তারা
নন্দিত রাগিণী।
কালোমেঘে
ডোরাকাটা
কোন্ বনে বাঘিনী।।
দোল দোল
দে দোল
মেয়েগুলি লতিকা।
রিয়াঙের
হজাগিরি
কবিতার কণিকা।।
হজাগিরি
নাচ বুঝি কোজাগরি বাতি লো।
ঢোল বাজে বাঁশিবাজে
ফাটে বুকের ছাতি লো।।
কলমীর
কানাভরা
কমনীয় পদ্ম।
হাতে থালা
গলে মালা
নাচে অনবদ্য।।

পার্টির প্রতি

পাবলো নেরুদার

(ODE TO THE PARTY কবিতার অংশ বিশেষ)

বাস্তবকে নিয়ে আমার সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছো তুমি
আর সে জন্য আমার সৃষ্টি প্রস্তরের মতোই দৃঢ়।
তুমি আমাকে শয়তানদের প্রতিপক্ষে এনেছ
আর দুঃসাহসী যারা তাদের পক্ষে
আমাকে বানিয়েছো এক দেয়াল।

যাকে প্রাচীর দিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছিল, তা
এবং সুখের সম্ভাবনাকে খোঁজার
এক স্বচ্ছ দৃষ্টি তুমিই আমায় দিয়েছ।
তুমি আমায় মৃত্যুহীন করেছ
কারণ আমার মৃত্যুর পর
আমি তোমার মধ্যেই অমর হয়ে থাকবো।

(অনুবাদ)

নদীর কাছে

এইখানে বারে বারে আসি এই নদী তীরে
সে এক আশ্চর্য নদী
আমার হৃৎপিণ্ডে যে নিয়েছে বাঁক
যার স্রোত প্রতিদিন জলে ধুয়ে রাখে
আমার হৃদয়ের সব ভালবাসা
যেন আয়নার মতন স্বচ্ছ জলরাশি।

সে এক প্রিয় নদী বর্ষায় মাতাল
সে এক প্রিয় নাম গোমতী আমার
কতদিন তার জলে মুখ দেখিয়াছি
দেখিয়াছি জেলে ডিঙি মাছের পেছনে ধাবমান
তার স্রোতে ভেসে যায় ভাংনা কাটারি
তার ঘাটে জল ভরে গাঁয়ের রূপসী।

শাওনের নদী তোরে কি নামে ডাকিব
তুই যবে ছিঁড়ে নিস শস্যের মাদুর
কেড়ে নিস কিষানির চোখ ভরা স্বপ্নের পাখালি
মাচায় আনত লাউ, ফুলে পুষ্ট ডগা
বাসমতী ধানক্ষেত আখের খামার
সারি সারি চাঁপাকলা থোড় নুয়ে আছে
বাঁশতলির ঘাট, রশিদের কালো বউ
রাবেয়া যেখানে নির্জন দুপুরে এসে
নদী, তোর কুশল জানিত
গোমতীর জলে ডোবে সেই সব স্মৃতির চাতাল

ভেসে যায় তটভূমি প্রাণের হরিণী।
তবু বার বার আসি অঘ্রান কিংবা বৈশাখে
পৌষের ভোরে ভিজা আলুর লতা কিংবা
চৈত্রে ফুট বাঙি তরমুজের ঘ্রাণ
উজ্জ্বল রাঙা পেকে আছে বিলাতি বেগুন
বার বার দেখে যাই চাষিদের কারুকৃত মাঠ
এই নদী এই তীর গোমতীর ঘাট
কতবার রেখে গেছি আমাদের অমল প্রার্থনা
আমার সোনার বোন, হে রুপালি নদী
কথা দে, হাত ছুঁয়ে বল্
বর্ষায় তুই এমন উতলা হবি না,
হবি না হবি না।

ইন্টারভিউ

কেমন আছো?
দেখা হল বহুদিন পর, যেন কত যুগ
পাশাপাশি মুখোমুখি পরস্পর
অথচ যোজন দূর
শব্দ যেন পৌঁছয় না।
যা বলার ছিল, বলা হল না
শুধু তার স্নিগ্ধ চোখে দেখেছি আশ্রয়
সেইখানে আলো জ্বলে স্থির,
বাতিঘর বুঝি
কোনো এক সামুদ্রিক জাহাজের ঠিকানা।
এখন বন্দি আছে সমস্ত অস্তিত্ব,
কল্পনারে দিয়েছি অবাধ বিস্তার
স্বপ্নে ও কবিতায়
সেই নম্র বালিকার তরে।
প্রিয়জন এলে, কাছাকাছি, প্রতিশ্রুতি
রেখে গেলে,
সমগ্র চৈতন্যে অনুভব করি
উষ্ণ দাহ।
সেও কি আমার বনলতা সেন?
মুখোমুখি প্রশ্ন করে, কেমন আছেন?
তার চোখে নীড় বেঁধে কোন্ পাখি কবে
সন্ধ্যা হলে ফিরে আসে স্বজনের ঘর?

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, আগরতলা কারাগার

কার্তুজের খোল

কালও এখানে পদচিহ্ন আঁকা ছিল
শীতের কুয়াশায় স্নাত ছিল রেখা
ভোরের রোদ মেখে সারা দেহে
একদল যুবকযুবতী কাজে গেছে, রোজ
বিকেলে ঘরে ফেরা টিলার ওপর
এই পথে ওরা গেছে, এখনো বাতাসে
শুখা মাছ ও সিঁদলের গন্ধ আছে নেশার মতন
গরম ভাতে গোদকের ঝাল
আহা,
এসব ভেবে ভেবে ওরা গেছে ঘরে সন্ধ্যায়
পিঠে ঘুমন্ত শিশুর মুখে মায়ের দুধের স্বাদ।
এই অরণ্যমালা, শাল সেগুনের ফুলে
মধু খোঁজা পতঙ্গের স্বর ছিল, ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা দুপুর
লংতরাই শাখান জম্পুই আঠারমুড়া কিংবা,
রাশি রাশি সবুজ পাহাড় ডাকাডাকি করে।
এই সব পাহাড়ি পথে পর্বত-কন্যারা আসে
সবুজ ঘাসের ডগায় পা রেখে ছড়াত স্বর্ণরেণু
সহচর যুবকেরা খোলা পিঠে বয়ে নিত
বুনো শুকরের অর্ধদগ্ধ লোভনীয় লাশ
ছড়ার ওপারে গঞ্জের সাপ্তাহিক হাট বসে।
এখন এখানে পড়ে আছে কার্তুজের খোল
বাতাসে বারুদের গন্ধ, গাছের আড়ালে
হাওয়ায় শিস দেয় হননের উন্মত্ত ট্রিগার
এখানে ওখানে রক্তের দাগ শুকায়

বাসি রক্তের গন্ধে বাতাসের দম বন্ধ হয়
তাজা বনফুলে আসে না প্রজাপতি; আর অবিশ্বাসে
ভয়ার্ত ভালবাসা পালায় দুপুরেই এখন
ভাঙা স্কুল ঘবে সকালেব রোদ পোহায় কুকুর
পড়ুয়া বালক বালিকার পুস্তকেব মলিন পাতায়
নিটোল ঘরের ছবি, বাঁশঝাড, গোল চাঁদ
ছিন্ন ভিন্ন আমাদের আঁধার বারান্দা।

কালও এখানেই পদচিহ্ন ছিল কোনো যুবক অথবা যুবতীর
এখন সাপের বুকের ছাপ, হিমেল শিহবন
মরা বোদে নিহত প্রীতি গড়ায় এখানে ওখানে
এই পথে আসে না বলিষ্ঠ যুবক, উদ্দাম যুবতী
তরুণীব খিল খিল হাসিতে কাঁপে না বাতাস
বাতাসে সাপের ফণা, শিস দেয় অজানা ভয়
এই পথে সেই গুরুকুল বগলে ছাতা ধরে
খালি পায়ে দ্রুত যায় না পদব্রজে আর,
এখন এখানে নির্বোধ সময়
বন্দুকের নলে খোঁজে আপাতত জয়
তাই ভালোবাসা খুন করে মরে আছে কার্তুজের খোল
এখানে বসে না হাট বন্ধ কেনা বেচা
বন্ধ বিনিময় হৃদযেব পারাপার মানুষেব।

১ জানুয়াবি ১৯৯৫, আগরতলা

হায় কপাল

মন্ত্রী দিলেন শিঙের গুঁতা
চেলায় দিল কিল
কেমন সুখে আছেন সাহেব
মাথার 'পরে চিল!
চিলে খায় বিলের মাছ
নেপোয় মারে দধি
ডোবা চুরি পুকুর চুরি
চলেছে চুরি নদী!
বাধা দিলে কুরুক্ষেত্র
উজির বাড়ান হাত
বড় বড় সাহেবেরও
ভাঙলো পাটির দাঁত।
মার খেয়ে হজম কর
বিচার সর্বনাশা
মুখ্যসচিব-বুঝিয়ে দেন
কঠিন ভালবাসা।
দেশের শত গুণী জ্ঞানী
সিভিল সার্ভিস পাশ
পশুর নেতা বুঝিয়ে দেন
ওরা যে খায় ঘাস।।

ভাগছে দ্যাখো কে

আকাশ জুড়ে
মেঘের খেলা
বজ্রে বাজে বাঁশি,
বুকে রাজার
ষাঁড়ের ছবি
মুখে প্রলয় হাসি।
দু'হাতে তার
সাপের ছোবল
ভীষণ ষড়যন্ত্র,
মাটি ভিজে
বীরের খুনে
জবাই গণতন্ত্র !
রাজার চেলা
থানায় বসে
দেদার টানে মদ,
দারোগাবাবু
সেলাম দেয়নি
তাইতো হলেন বধ !
বাঘে কামড়ায়
ছাগে কামড়ায়
ল্যাংড়া দেখায় পা
খাঁচার ভিতর
পুলিশ ঝিমায়
বুনো সিংহের ছা।

পুষি ক্যাট

পুষি ক্যাট
পুষি ক্যাট
পোষ মানা বিল্লি।
মার্কিনে
লেজ তোব
সংসদে চিল্লি !!
কালো টাকা
আলো করে
কত টাকা গিল্লি ?
হাঁক ডাক
রাখ বাখ
থমথমে দিল্লি !!
ক্যাট লো
ক্যাট গো
জার্মানে
পিসি তোর
ইটালিতে বাপ।
থেচারের
মাসি তুই
পাচারের সাপ।।
পুষি ক্যাট
পুষি ক্যাট
সুইডেনে লক।
ধরা পড়ে
মরি মরি
চুপচাপ বক !!

রেলগাড়ি

চাকায় চাকায় রেল
গাছে পাকা বেল
সরিষার তেল
পা ফস্‌কে গেল্।।

রেল চাই বেল
পেলাম পাকা বেল
বেল পাকলে কাকের কী ?
পান্তাভাতে গরম ঘি।।

ঘিয়ের গন্ধ কড়া
রেলের শব্দ চড়া
পেচারথলে বাজলে শিস
সাক্রমে তুই বুঝে নিস্
একবিংশে ছাড়ছে গাড়ি
টিকিট কাট তাড়াতাড়ি।
আসছে রেল ঝমাঝম
নেইকো দাঁড়ি কমা কম
হাতির বদল পেলাম আলু
খুব শীগ্‌গির হবে চালু
রেলের গপ্পো আলুর দম
আসছে গাড়ি ঝমর ঝম।।

আসছে রেল
পাকছে বেল
রেলের গপ্পো আলুর দম
আসছে গাড়ি ঝমর ঝম।।

আসছে রেল
পাকছে বেল
রেলের ভিতর ইস্টিশন
খোকন রে তুই গল্প শোন
ইস্টিশনে মিস্টি দই
খেতে ভাল শুকনা খই
রেল আসবে ঝম ঝম
পা ফস্‌কে আলুর দম
আমরা করি আন্দোলন
দিল্লি থেকে প্রভু কন
নব্বই মন
পোড়াও তেল
নাচবে রাধা
আসবে রেল।।

লাল ইস্তেহার

ঘবেব দাওযায
আঁধাব ছিল
ঘবেব ভিতব কান্না।
দিন দুপুবে
ব্যাঘ্র ছিল
ভাত ছিল না রান্না।।

গুদাম ভরা
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
চাল ঝবেনি কভু।।

পেটেব ভিতর
ক্ষুধা ছিল
ভ্রূণে ছিল শিশু।
ভাতের জন্য
বিদ্ধ হল
জননী ও শিশু।।

দেশপ্রেমিক
জবাই হলেন
কশাই হলো বাজা।।

বাজা ওবে
বাদ্যি বাজা
চামড়া ভাজা ভাজা।।

আজকে মে
পযলা মে
লক্ষ হাতে তূণ।
আজকে দে
জাগিয়ে দে
ঝড়েব অগ্নিকোণ।।

১ মে ২০০৩, আগবতলা

এখনো জাগেনি রাত

এখনো জাগেনি রাত
এখনো ডাকেনি পাখি
এখনো ফোটেনি ফুল
তোমার কেশদামে এখনো ঘুমায় মেঘরাশি
বুকের শয্যার 'পরে প্রিয়জন নিদ্রায় জড়িত
এমন মগ্ন মুহূর্তে তোমার জন্যে
বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ ঢালে কুসুমের মাস
দক্ষিণ সমুদ্র থেকে আসে শিহরন
তুমি জাগো নাকো প্রিয়া
তোমাব ঘুমের চোখে
হারানো রাজকন্যারা আবার এসেছে ফিরে
আবার গোল চাঁদ সিঁদুরের ছোপ
কাজলের রেখা
সেই হারানো দিনের স্মৃতিমালা।

এখনো জাগেনি রাত
এখনো ডাকেনি পাখি
এখনো ফোটেনি রোদ,
হে প্রিয়া তুমিও ঘুমাও এখন
তোমার ঘুমের জন্য
কুসুমের মাস এনেছে ঘ্রাণ
সমুদ্র পাঠিয়েছে দক্ষিণের শিহরণ
এখনো জাগেনি রাত।

৪ মার্চ ১৯৯৫, আগরতলা

আমরা আসছি

আমরা একদিন কেড়ে নেব রাজদণ্ড
একদিন আমরাই শাসক হব
তখন সমস্ত তল্লাটে পাঠাব ফরমান
বিপ্লবী পুনর্গঠনের নথিপত্র।
যাদের হাত আছে তাদের জন্য ভাত চাই
যারা শ্রমবিমুখ
কিংবা মধ্যস্বত্বভোগী দালাল
অথবা পরজীবী
তাদের হাত থেকে কেড়ে নাও তমসুক।
যাদের পদধ্বনি মাটিকে জাগায়
তারাই পাবে মাটির জিম্মাদারি
এদেশের ভূমিপুত্রগণ,
যাদের রক্তে শস্যের রং সোনা হয়
আমি তাদেরই আত্মজ
ভূমিপুত্রদের অন্ত্যজ সন্তান
আমরা একদিন শাসন করব এই দেশ
তাই গর্বে কাঁপছে আমার চোখ।
যারা আমাদের চোখ রাঙিয়েছে চিরকাল
এখন আমরাই চোখ রাঙিয়ে বলছি
পথ ছাড়ুন
আমরা আসছি
কামার কুমার হাড়ি মুচি ডোম
জেলে তাঁতি চাষি আর চণ্ডালেরা
যারা ওপরে বসে আছেন প্রভুগণ
পাহাড়ের চূড়াটি দখল করে,
তারা নামুন
আমরা আসছি
আমাদের পদভরে কাঁপছে দেশ
দেশের মাটি !

তোমার জন্য হে প্রিয়া

মাঝে মাঝে মনের ভেতর
উঁকি দেয় তোমার ভালবাসার মুখ
তুমি এসে দাঁড়াও
বহুদিন দেখি না তোমায়
বহুদিন পাইনি খবর
কেমন আছো
কখন ফিরে আসো ঘরে
বিকেলের ক্লান্তি ঠেলে ঠেলে।
দেয়ালে নজরুল সুকান্ত রবীন্দ্রনাথ
কমরেড লেনিন বাবুর শিশুকালের কচিমুখ
এক আলমারি বই, এলোমেলো কত জিনিস
আমার নিত্য কাজ, লেখাপড়া, ঘুম।
অথবা বিবর্ণ মুহূর্তের সাথীরা
এবং তুমি।

বর্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখা
শীতে রূপোর মত চকচকে রোদে বসা
বসন্তে দখিনা বাতাসের সাথে প্রিয় আলাপন
এবং তখন পাশে থাকো তুমি।

তুমি সারাদিন ব্যস্ত থাকো
কাজে রান্নায় স্কুলে আর ছেলেকে পড়ানোর নেশায়
আমার অবাধ ছুটি, দুরন্ত অশ্বের পিঠে চড়ে
প্রতিদিন লড়ি শত্রুর সাথে

তুমি বলেছো, তোমার যুদ্ধই আমাদের ভালোবাসা।
তুমি দুরন্ত সাহসে বলো
ভয় কিসের দিন বদলাবেই।
এতদিন তোমাকে দেখেছি নিরুত্তাপ
আজ দেখি দ্বিধাহীন দুঃসাহসের
ডানা মেলে উড়ে যাও ঝড়ের মুখে
এখন মিছিলে হাঁটো তুমি, একাই যাও ধর্মঘটে
আমার ভীষণ ভালো লাগে
তিলে তিলে গড়ে উঠা তোমার রণসাজ, কমরেড।

একদিন তুমি কেঁদেছিলে আমার জন্য
আজ তুমি দ্বিধাহীন
যুদ্ধে যাও আমার জন্য।

জেলের চিঠি

আমরা যেন জড়িয়ে আছি স্বপ্নে ও কাঁটায়।

অদ্ভুত এক ভালবাসার দেশ
আমার মায়ের মুখ
প্রিয়ার চোখে আশ্চর্য প্রেম
আমাদের কবিতার গুচ্ছ গুচ্ছ প্রাণরাশি
এখানে ওখানে হামেশাই উপদ্রুত এখন
আমরা এখন জেলে আছি।

মণি, সোনা আমার
কতদিন তোমার কচিমুখ দেখি না
যেন বহুদিন এমন নরম উজ্জ্বলতা দেখি না,
প্রিয়া আমার, কত রাত তুমি কেঁদেছ নিঃসঙ্গ
আর সেই অশ্রুতে লিখেছ পত্র,
মাগো, তোমার চোখের নীচে জমেছে আরো কালি।
এখানে দিনে দিনে মাস, মাসে বছর যায়,
ভারতবর্ষের কোনো এক কারাগারে আছি আমি
এবং আমাদের অন্যান্য কমরেড,
তোমাদের দেখার অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষায় কাতর।

মাঝে মাঝে বুকের ভিতর নাচে সমুদ্র
চোখের ডগায় যন্ত্রণারা ফোঁসে —
মনে হয় দু'হাতে দারুণ শব্দ করে
তোলপাড় করি, তোলপাড় করে ভাঙি কিছু।
ভাবি, কোটি বাহুতে যদি চমকায় বিদ্যুৎ

কোটি অশ্বের পদশব্দে কাঁপলে মাটি
কোনো আক্রমণে যদি গুঁড়িয়ে যায় একটি মসনদ,
আমরা বেরিয়ে আসি মুক্ত হয়ে
কেমন হয় !

মণি, সোনা আমার, আমরা আসছি
এসে দেখব, তুমি বড় হয়ে গেছ এখন
আমার স্বপ্নের সমান।

মাগো, আমরা আসব
তুমি অতদিন বেঁচে থেকো,
তোমার চোখের জল মুছে দেব
আমার পিরানের কাপড়ে,
প্রিয়া, আমার যন্ত্রণার ফুল, তুমি কেঁদো না,
আমি আসব
আবার তোমার গান শুনব নিবিড় প্রেমে।

আজব দেশ

কোথায় এলাম ?
বুঝি ভূতের বাড়ি
ছায়া ছায়া মুখোশ মালা
শ্মশান সারি সারি

মরা নদী
জোড়া দীঘি
দীঘির পাড়ে চিতা
রাম গিয়েছে খুঁজতে হরিণ
রাবণ হরে সীতা !!
কি যে চালাচালি
দিনে দেখি জয় মা তারা
রাতে বনমালী !

আজব দেশের
আজব কথা
মন্ত্রী টাকায় মিলে
গণতন্ত্রের ইতিকথা
কাঁঠাল পাকে কিলে !!

বদলালো না ঘানি

আজি ডাঙ্গা কাজি ডাঙ্গা মধ্যে ধনেখালি।
ধান ভানতে শিবের গাজন কেবল পিরালি।।
পির গেলেন গঙ্গানদী দু'পারেতে জল।
দেশপ্রেমের বন্যা লেগে চক্ষু ছলো ছল।।

রাজ্যি দেব কন্যি দেব দেব সোনার পাত।
বুড়ো হেংলার মুখ ভরাব রূপায় বেঁধে দাঁত।।
মাটির নীচে রেল চড়াব মেলায় চড়ক গাছ।
ঘুঘুডাঙ্গার দই খাওয়াব, কই লো চিড়া ভাজ।।

পেলাম নদী রক্তে ভরা কন্যা পেলাম রাঁড়ি।
মাটির নীচে কবর পেলাম ধর্ষিতা এক নারী।।
সমাজতন্ত্রে দেবী পেলাম রাজার বদল রানী।
সাদার বদল কালো পেলাম বদলালো না ঘানি।।

শেষ খেয়া

পান খাও
গান গাও
নাচ ভোট রঙ্গ
নিতে ভোট
বাঁধো জোট
মুখ পোড়া কঙ্গ।।

শত তালি
বন মালী
শিস দেয় বাঁশিতে
ভোট এলে
ঠোঁট মেলে
বিষ মাখা হাসিতে।।

বিষাদ

তোমার দু চোখে বিষাদ
মনে হয় মুখে গোল চাঁদ
মৃত জোছনায় ঢাকা।
তোমার বুকে ঘন মেঘের মতন
ছায়া রেখে গেছে স্মৃতি
এখানেই যেন দীর্ঘ এক আবাস
সন্ধ্যার পাখিদের ফিরে আসা নীড়।

তোমার দুচোখে আলো ফুটলেই
রাত ভোর হয়
ফুল ফোটে বনে ও বিজনে
তোমার দুচোখ থেকে
বিষাদ সরিয়ে দাও
ওষ্ঠে রাখো প্রথম বৃষ্টির মতো
চূর্ণ চূর্ণ মৃদু আলাপন।

নামুক তোমার বুকে রাত্রি এখন
ফিরে আসুক সন্ধ্যার পাখিরা।

পবিত্র ঘৃণা

এখনো যে জ্বালায় কল্‌জেয় বাতিঘর
এখনো যে রক্তের নদী পার [illegible]
ওপারে খুঁজি [illegible]
তার প্রতি আমার ভালোবাসা রইলো।

বন্ধু, প্রতিদিন আমাদের রক্ত মাড়িয়ে
আমার মায়ের দেহে উৎকট ব্যভিচারে মত্ত
যে দানব সে, কামিনী কাঞ্চনের প্রতি
অনীহার কঠিন কাহিনী শোনায়
আর শ্মশানে জ্বালে ধোঁয়া
তার প্রতি রইল আমার ঘৃণা।

জন্মাবধি আমাদের ঘরে আসে
ক্ষুধা মৃত্যু, আসে ভালবাসা [illegible]
তাদের প্রতি সে ঘৃণাকে [illegible]
খাপ [illegible]
আর এক হিংস্র উত্তাপে
প্রতিদিন দগ্ধ করে যাবো [illegible]

জীবনের জন্য

এখন যেখানে আছি
বেশিক্ষণ থাকা যাবে না
গুপ্তচর ঘাতকের দালাল
শুঁকছে পদচিহ্ন প্রশ্বাসের ঘ্রাণ।

সামনে বাঁকা পথ
জটিল অন্ধকারে ক্যাকটাস
সাবধানে পা ফেলো
পেছনে দেয়াল কাঁটায় আবৃত।
আমাদের গলায় শিকলের মালা, বন্ধু
বধ্যভূমে রক্তের আরতি
কাঁধে আমাদের শহিদেব মৃত্যুহীন লাশ।

সাবধানে পা ফেলো
মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ
সাবধানে পথ চলো
শত্রুর কুচকাওয়াজ।
এসো বন্ধুরা ঢালবো বক্ত
এসো বন্ধুরা ভালোবাসার জন্যে হাঁটবো পথ
এসো যোদ্ধারা জীবনেব জন্যে ধরবো আয়ুধ।

যেন গাঙচিল

কবিতায় পাঠ তার
সবই তার ছন্দ।
ফুলে ফুলে কুসুমিতা
মধুমিতা গন্ধ।।

দোল দোল বনফুল
ফুলে ফুলে অলি।
চারুবাক কারুবতী
ঝিলিমিলি জলি।।

ঝিলমিল ঝিলমিল
মিল মিল খিল খিল।
জলভরা দীঘি বিল
বুকভরা নভো নীল।।

কবিতার নেশা তার
নেশা তার বিল।
খাঁচাছাড়া পাখি এক
যেন গাঙচিল।।

সে

ডাগর চোখে
সাগর দোলে
নাকের ডগায় তারা।
বুকে ঘুমায়
জ্যোৎস্না রাত
নিঝুম স্বপ্ন ভরা।।

চোখের ভিতর
দখিন হাওয়া
ফোটায় চম্পাকলি।
চপল মেয়ের
অলক দামে
গুঞ্জরিত অলি।।

রুদ্ধ দুয়ার
খুলল কখন
জানিনা সেই কথা।
হঠাৎ দেখি
মাতাল বাতাস
কাঁপিয়ে দিল পাতা।।

জ্যোৎস্নার ফুল

বনতলে পিকনিক
জলতলে ঢেউ,
কুন্তলে মেঘরাশি
দেখেছ কি কেউ ?
দেখেছ কি তটিনীর
ভাদরের রূপ,
শীতে সে-ই নাবালিকা
একেবারে চুপ!
জ্যোৎস্নার ফুল সে তো
বিজলীর রেখা,
ঝর্নার কলকল
আলোকের লেখা।।

ঢোঁড়া সাপ

কেমন ছেলে ?
বেটা ছেলে।
কেমন বেটা ?
বাপের বেটা।
কেমন বাপ ?
ঢোঁড়া সাপ।

ঢোঁড়া সাপের লেজ
নড়ে চড়ে বোঝায় তেজ।

রেলের চাকা ঝম ঝম

রেলের চাকা ঝম ঝম
যাচ্ছে গাড়ি দমদম
দমদমের মিষ্টি কুল
দিন দুপুরে তারার ফুল
তারা ফুলের গন্ধ নেই
যাচ্ছে কে রে ? এই তো সেই।
সেই লোকটি ? নামটি কি ?
পান্তা ভাতে মাখতো ঘি,
দমদমের কেষ্ট ঘোষ
দাঁড়িয়ে ঘুমায় নেই কো হুঁশ।

ঘুরছে চাকা ঝম ঝম
থাকছে গাড়ি দমদম
ডাকছে গাড়ি হুস হুস
চমকে ওঠেন কেষ্ট ঘোষ।
কাদায় শুয়ে তিনটি মোষ
মোষের শিঙে ফিঙ্গা
ফুল ফুটেছে ঝিঙ্গা
ঝিঙ্গা ফুলের গন্ধ
নাচে জামাই নন্দ।

হাসে বউ মিষ্টি
মেঘলা দিনে আকাশ দিল
ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি।

ময়নামতী কংকাবতী

ময়নামতী কংকাবতী
পিদিম জ্বালে কে ?
ছাতিম গাছে হুতুম ডাকে
সন্ধ্যা নেমেছে।
নদীর জলে জ্যোৎস্না লেগে
কেমন হেসেছে
জলের বুকে ঝিকিমিকি
রূপা ভেসেছে।

ময়নামতী কঙ্কাবতী
রূপবতী বোন
মেঘের ভেলায় চাঁদ ভেসে যায়
পাগল পাগল মন।

ময়নামতী কঙ্কাবতী
চম্পাবতী কই
যমুনাবতী সরস্বতী
পালিয়ে গেল ঐ।।

সর্পিল

প্রিয়ার সাথে
কথা ছিল
হিয়ার কাছে চাই।
কুঞ্জবনে
গোপন ফোনে
কথা হল তাই।।

আড়ি পেতে
নাড়ীর খবর
কে ধরেছে কে ?
বড্ড বোকা
তোতলা খোকা
ভুল বলেছে সে।।

আমি জানি
আমার ব্যথা
তোমরা দিলে গাল।
গালি শুনে
চমকে গেছি
ভাত খাইনি কাল।।

তবু যদি
মন্দ বল
বন্ধ হবে চাকা।
রাষ্ট্রপতির
শাসন দেব
বুঝবে কেমন কাকা।।

কাক ডাকে কা কা
কাকার মাথায় টাক।
সাপের লেজ নড়ে চড়ে
শকুন ঝাঁকে ঝাঁক।।

বিউটি

নাই গুণ
মুনমুন
নাম তবু বিউটি
নাই বাণী
খানদানী
ভোটে শুধু ডিউটি।
তালি তালি
জোড়াতালি
বাড়ি ছিল ইতালি।
পতি হাবা
মতিবালা
ভোটে আজ গীতালি।
খুব আছে
রূপ তার
আগুনেতে জ্বলছে।
জ্বলে পুড়ে
যৌবন
ভোট দিন বলছে।।

শিশুমহল

শিশুমহল
করুক দখল
শিশু মনের আকাশটা।
তোমরা যারা
বড় শিশু
রক্ষা করো বাতাসটা।।

আকাশ জুড়ে
মেঘ রোদ্দুর
বাতাস জুড়ে খেলা।
কল্প লোকের
সাগর জলে
ভাসুক স্বপ্ন ভেলা।।

শিশুর মনে
বৃষ্টি নামুক
সৃষ্টি ভরুক ফুলে।
পূর্ণ হোক
শিশু মহল
হাজার শিশুর দোলে।।

রক্তাক্ত লেক চৌমুহনী

রৌদ্রে শুকায়
তাজা রক্ত
রক্ত চাটে মাছি।
বোমায় মরল
সোদর ভাই
চিতায় পুড়ল বাঁশি।।

পাহাড় জ্বলে
ফিফ্‌টি সিক্সে
শহর পোড়ে বোমায়।
গুপ্ত ঘাতক
টিপছে বোতাম
আগরতলা ঘুমায়।।

বাঁশেব কড়ুল
জুমেব বেগুন
কচুরলতি কুমড়া।
রক্তে ভিজে
রাজধানী
বেঁচে আছো তোমরা ?

পাহাড় ভাঙে
অন্তর্ঘাতে
শহর বিস্ফোরণে।

ভর দুপুরে
আঁধার রাত
শবযাত্রার যানে।।

রৌদ্রে জ্বলে
জমাট রক্ত
রক্তে জমাট মুখ।
ভায়ের জন্যি
ভায়ের বুকটি
স্তব্ধ পাথর — শোক।।

মিষ্টি

চম চম ক্যাডবেরি
আরো ভালো মিষ্টি।
রসমালাই সীতাভোগ
কত বড় লিষ্টি।।

জিলিপির মত স্বাদ
স্বাদে ভরা ফিষ্টি।
জল দে পানি দে
মেঘে মেঘে বৃষ্টি।।

জল পড়ে পাতা নড়ে
নড়ে দীঘির জল।
গুড় মিষ্টি সুর মিষ্টি
মিষ্টি আতা ফল।।

মিষ্টি নামটি কত মিষ্টি
যেন দুধের সর।
ইহার চেয়ে অতি মিষ্টি
মিষ্টি মেয়ের বর।।

শুধু ছড়া

আয়নার মার পিসীর বাড়ি
ময়নাব-মার গ্রাম
মনুনদীর এই পাবেতে —
কেমন মিষ্টি নাম।

বোয়াল মাছের ঝাঁক ভেসেছে
পাবদা মাছের দাড়ি
নদীর ঘাটে নাইতে এসে
উল্টে আছে গাড়ি ।

মনুনদীর জলে আছে
জলেব মতো দই
সে দইয়ে রান্না হয়
ধূমাছড়ার কই।

গন্ধ পেয়ে বনের শিয়াল
ঘাপটি মেরেছে
ছৈলেংটার নেংটা ফকির
তেড়ে এসেছে।

কাটুস কুটুস

কাটুস কুটুস
কাঠবিড়ালি
চমকে চমকে চাও
গাছের ডালে
লম্ফ দিয়ে
কোন্ দিকেতে ধাও ?
আমের ডালে
আম পেকেছে
নুয়ে আছে ডাল
একটি আমায়
দাও না ছুঁড়ে
নয়তো দেবো গাল।
কাঠবিড়ালি
দুষ্টু খুকি
মুখপুড়ি তুই যা
কাটুস কুটুস
কাঠবিড়ালি
ছাই ভস্ম খা।
কাটুস কুটুস
কাঠবিড়ালি
লেজ নাচিয়ে কয় ঃ
খুকি আমার
পিসিমণি
আর করি না ভয়।
কাঠবিড়ালি
হাড়জ্বালালি
কুট কুট কুট গানে
লজেন্স দেবো
ঝাল চকলেট
আয় নেমে এখানে।

মজার শহর

মজাব শহর
কলকাতাতে
মানুষ ঝোলে বাসে,
মাটির নিচে
রেলের গাড়ি
নিত্য যায় আর আসে।

কলিকাতা
আজব শহর
চলে পথে ট্রাম,
কলিকাতা
হোম স্যুইটেস্ট
দই মিঠাইয়ে জ্যাম !!

হাট্টিমা টিম টিম

১

চুপ কর ভাই নন্দ
কথা বলা বন্ধ
বন্ধ আড়াআড়ি
ভাঙলে বিধি
বসিয়ে দেব
স্পেশাল পুলিশ ফাঁড়ি !!

২

ডুববে কে ভাসবে কে
দারুণ বিভীষিকা
থরো থরো হিমাচল
কন্যাকুমারিকা।
একক বলে
নেই যে কিছু
কেবল কোয়ালিশন
ভোটের আগে
নোটের পর্ব
পেলাম নমিনিশন !!
ভোটে জিতে
অশ্ব দেব
অশ্ব দেবে ডিম।
ডিমের ভিতর
সমাজবাদ
হাট্টিমা টিম টিম
রেল দেব
তেল দেব
দেব গোলক ধাঁধা
প্রভুর পায়ে
ধান্য দূর্বা
তোমার পায়ে রাধা।।

মৃত জ্যোৎস্নায়

মেঘে ঢাকা চাঁদ যেন
কফিনে জড়ানো সদ্যমৃত যুবতীর মুখ
অস্পষ্ট আলোয় মলিন জ্যোৎস্না
যেন শোকের চাদর মেলেছে
অন্তহীন জলরাশি জুড়ে।

উপবনে সারি সারি ঝাউয়ের শাখায়
রাত জাগা ক্রন্দনের মতো সমুদ্র বাতাস
বার বার জাগায় বিস্মৃত যত শোকরাশি
জেলেদের ডিঙিগুলি ডুবেছিল জলে
সেই থেকে ঘরে ঘরে বধূগণ পরিয়াছে
বৈধব্যের করুণ পোশাক
যারা গেছে জলে তারা আর ফিরে নাই
এই সমুদ্রে সৈকতে ঝড়বাদল জোয়ারের
প্রবল প্রলয়ে, তবু মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে
ওরা জন্মায় বাড়ে বার বার দুরন্ত সমুদ্রে যায়।

আজ জ্যোৎস্না রাতে, সমুদ্র মেতেছে
মাতাল জোয়ারে
উপবনে শোকার্ত নিঃশ্বাসে যত শোকরাশি
বার বার কেঁদে যায়
যাদের ছিল না কিছুই
গিয়েছিল গভীর সমুদ্রে তাই
ঝড়ে ঝরে গেল তারা
তারা আর আসবে না ফিরে
তাই পূর্ণিমার চাঁদ যেন মনে হয়
ধূসর কফিনে ঢাকা
সদ্যমৃত রমণীর মুখ।

২০ জুন ১৯৯৭, দীঘা

চড়া শব্দে

বন্ধুরা, চড়া শব্দে কথা বলো
আকাশ কাঁপুক
বুকের ভিতর যত নদী আছে অশ্রুর
উদ্দাম করো প্রাণ-বন্যায়
এখন ভাসিয়ে দিতে হবে জীর্ণতা।
চলো চড়া শব্দে ঘোষণা করি,
যা মানার নয়
কোন দিন মানবো না।

বেটন ধরেছি

ধিতাং ধিতাং বোলে
ইন্দ্রাণী মোর কোলে
সমাজবাদেব মোহর মালা
কণ্ঠে আমার দোলে
দুঃখ যাবে চলে
আর কিছুদিন সবুর কর
ঘোমটা খুলেছি।

ভোটে জিতলে চাঁদি দিমু
গাই বাছুরের দুধ খাওয়ামু
সোনাব খাড়ু গড়িয়ে দিমু
লক্ষ কোটি ট্যাকসো নিমু
গরু মেরে জুতো দেবার
দিব্যি করেছি,
ভর সন্ধ্যায় চরকা ছেড়ে
বেটন ধরেছি।।

সাম্যবাদ

বেবটোলড ব্রেখট

সাম্যবাদ দুর্বোধ্য নয়, খুব সহজ
যে কোনো লোকেই বুঝতে পাবেন
খুব সহজ ব্যাপাব
শোষক না হলে
আযত্ত কবতে পারবেন
সাম্যবাদ আপনার জন্যও
হিতকব, বিষয়টি বুঝে নিন।

যাঁরা আসলে নির্বোধ
কেবল তাঁরাই বলেন, সাম্যবাদ নির্বুদ্ধিতা
যাঁরা অবক্ষয়ী তাঁরাই বলেন
সাম্যবাদ পচে গেছে
সাম্যবাদ যাবতীয় ক্ষয় ও মূর্খতার বিরুদ্ধে।
শোষকগণ মনে করেন সাম্যবাদ একটি অপরাধ
কিন্তু আমবা জানি
সাম্যবাদ সমস্ত অপরাধের অবসান আনে।

সাম্যবাদ পাগলামি নয়
সমস্ত পাগলামিকে শেষ করে
সাম্যবাদ নৈরাজ্য নয়, সমাজব্যবস্থাব
শ্রেষ্ঠ অনুশাসন।
সাম্যবাদ একদম সোজা বিষয
তাই একে প্রতিষ্ঠা করা এক কঠিনতম কাজ।

(অনূদিত)

ফকির ইয়াসিন শাহ্

মাটির দেয়ালে ধস নেমে যায় পাষাণে ধরেছে চিড়।
তোমার দরগায় পারাপার আজ ইয়াসিন শাহ্ ফকির।।
হেথায় ছিন্ন সকল দৈন্য বেদ - কোরানের ফাঁসি।
রক্তে ভেজানো ধর্ম-মালিকা এখানে হল যে বাসি।।
চাঁড়াল যবন গলাগলি করে এক পাতে খায় ভাত।
এক জননীর সন্তান দল এখানে তাড়ায় রাত।।
আসমান নয় মাটি ভাগ হয় ধর্ম-জাতের ঝগড়ায়।
এখানে আকাশ লুটিয়ে পড়েছে ইয়াসিন শা'র দরগায়।।
বুকের ভিতর সুরমা ও মেহেন্দি এক নদী শুধু প্রেম।
মনমোহিনী ও ফাতিমা জননী নিকষিত যেন হেম।।
মুসাফির তুমি যেয়ো না যেয়ো না মসজিদে নাই তালা।
মন্দিরে আজ পুরোহিত নাই তোমার পান্থশালা।।
আউল বাউল এখানে ভেঙেছে মোল্লা-পুরুত-তন্ত্র।
ইয়াসিন শা রাধারমণেরা গাহে মিলনের মন্ত্র।।
এখানে মিলেছে শত নদ নদী ভেদাভেদ যায় তল।
প্রেম সাগরে ডুব দিলে মিলে প্রেমের শতেক দল।।
মুর্শিদ গায় মানুষের জয় বাউলেরা নয় ভিন্।
নিত্যানন্দের প্রেমের বাজারে ফকির লালন ইয়াসিন।।
মক্কা ও কাশী হার মেনে যায় এই হৃদয়ের ঘরে।
দেহের কাবায় মনের মানুষ হৃদয়ে বিরাজ করে।।

ভোট বিনোদিনী

পুষ্প বনে
পুষ্প ছিল
পুষ্প গেল কই ?
কুরসি ছিল
কুবসি নাই
নেপোয মাবে দই।।
একাত্তবে
হাওয়া ছিল
বাহাত্তরে চমক
পঁচাত্তরে
রাত্রি এল
নিশায় পিসার ধমক।।
সাতাত্তরে
রাত্রি টুটে
একটু খানি রোদ
পুত্র গেল
মাতা গেল
ভোটের প্রতিশোধ।।
ফুলের বনে
[illegible]
[illegible] সারি
[illegible] ভোটে
[illegible] এলো
সেই ললিতা নারী।

মালঞ্চে তোর
বসন্ত নাই
বাজে না ঢাক তূর্য
যতই বলিস
উদিবে না
একাত্তরের সূর্য।।

(সংক্ষেপিত)

উনিশে মে

(বরাকেব ভাষা শহীদদের প্রতি)

একটি নদী উথাল পাথাল
একটি নদী বরাক।
নদীর জলে আগুন জ্বলে
নদী আগুন ছড়াক।।

সেই নদীটি মেঘনা তিতাস
ব্রহ্মপুত্রের গান।
এই নদীটি একাদশটি
বলির উপাখ্যান।।

একটি নদী আকাশ দিল
আকাশ দিল রোদ।
সেই রোদে শুকায় ক্ষত
রক্তস্নাত বোধ।।

উনিশ এলে এই নদীটি
কমলাবতীর পালা।
কে পরেছে রক্ততিলক
গলায় রক্ত মালা।।
একুশ এলে কৃষ্ণচূড়া
উনিশ এলে জবা।
একুশ উনিশ মাতৃ ভাযা
শহীদবেদীর শোভা।।

একুশ আসে লক্ষ প্রাণে
উনিশ গানে গানে।
মা কমলা রফিক সালাম
নদীর কলতানে।।

নয়া দিল্লী, ১৯. ০৩. ২০০৭

ঢাকা আগরতলা

এপারেতে পাহাড় চূড়া
ওপার নদীর ঢেউ।
এপারেতে কানুর বাঁশি
ওপার পাগল কেউ।।

এপারে গান ওপারে প্রাণ
মধ্যে হাজার কাঁটা।
একই আকাশ একই মাটি
তবু বারণ হাঁটা।।

অবশেষে বাজল বাঁশি
সীমান্তে দ্বার খোলে।
আগরতলায় ঢাকার বাস
বক্ষে হৃদয় দোলে।।

ধর্ষিতার প্রতি
(ইমরানা বিবির জন্য)

বহুকাল পর একটি মেয়ে
শরিয়তের গুহা থেকে
ঘনীভূত পাপ থেকে
তমসার গুপ্ত জাহান্নাম থেকে
বেরিয়ে এল
এবং বলল, আমি ধর্ষিতা
আমার ধর্ষক
বোলা মহম্মদ আমার শ্বশুর।
মেয়েটির সারা দেহেই
সাপের ছোবল
অধিকারের দাঁত
নরকের দাগ
এখনো রমণী বোরখায় ঢাকা
ছিল রান্নাঘরে নির্বাসিত
আগুন দগ্ধ করেছে প্রতিদিন
সে ছিল শরিয়তের নিবিড় পাহারায়
অবরুদ্ধ
শ্বাসরুদ্ধ।
মেয়েটি অবশেষে একদিন
আদালতে দাঁড়িয়ে বলল,
ধর্মাধিকার
আমি জননী
আমি প্রিয়া, আমায়
আমার স্বামীর কাছে যেতে দিন
নুর ইলাহি আমার পতি।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দেশ
প্রবল তুফানে ভাঙল বনস্পতি
কেঁপে উঠল ধর্ম ব্যাপারিগণ
কোটি বিবেক বলল ঃ
নারীকে ভাগ্যজয়ের
অধিকার দাও ঈশ্বর।
কিছু মোল্লা আর মৌলবাদীরা বললেন,
এখন থেকে শ্বশুরই হবে
ইমরানার স্বামী
পতি হবে তার পুত্রবৎ
অন্যথায় ইসলাম বিপন্ন হবে !

মুহূর্তেই ইমরানা
মেঘ হয়ে গেল
ঝড় হয়ে গেল
বহ্নিশিখা হল
মেয়েটি বলল,
থুথু দিলাম ফতোয়ায়।
খোদার আসন
বেহেস্তের দরোজা
ধর্মের মুখোস
বার বার নড়ে উঠল।
ঈশ্বর অস্থির
মানবতার পুত্রগণ কাতর
বহুকাল পর

একজন মুসলিম রমণী
আদালতে দাঁড়াল
প্রভুদের গুপ্ত কথা বলার জন্য।
হে সূর্য
তুমি মেয়েটিকে রৌদ্র দাও
হে আকাশ
তুমি মেয়েটিকে মেঘমালা দাও
ছায়া দাও
বৃষ্টি দাও।

হে বসুন্ধরা
তুমি ইমরানাকে সমুদ্র দাও
অবারিত মুখরতা দাও
আমরা এখন
সমুদ্রের সিম্ফনি শুনব।

আম্বেদকর

একটি বালক
খেলত ভাল
খেত খালের জল।
সেই বালক
পড়ত ভাল
ভাল ক্লাসের ফল।।

(তবু) ছোঁয় না কেহ
যায় না কাছে
হাত ধরে না তার।
কারণ বালক
ম্লেচ্ছ ছিল
বাপ ছিল মাহার।।

একসাথে নয়
আহার বিহার
এক সাথে নয় রঙ্গ।
এই ভুবনের
সংক্রামকে
নিষেধ পরসঙ্গ।।

মাহার বালক
পায় না আদর
বসে মাটির চটে।
বিদ্যালয়ে
কয় না কথা
(যদি) শব্দ দূষণ ঘটে।।
(বালক) বিদ্যা শিখে
বিজ্ঞ হল
গেল সাগর পাড়।
জ্ঞানে গুণে
শ্রেষ্ঠ হল
হল ব্যারিস্টার।।
বিলাত ছিল
ভাল ছিল
সাদা কালো সম।
দেশে ফিরেই
আবার ম্লেচ্ছ
ছোঁয় না বুঝি যমও।।
(তিনি) মন্ত্রী হলেন
পিয়নটিও
দেয় না তারে গ্লাস।
শূদ্র হবার
প্রবল সাজা
আটকে যায় রে শ্বাস।।

সারা জীবন
অভিশপ্ত

জীবন যেন বিষ।
কুয়া নিষেধ
দেব্‌তা নিষেধ
যুদ্ধ অহর্নিশ।।

সেই যুদ্ধে
বাবা সাহেব
স্বর্গে দিলেন হানা।
দেবতারা
থরো থরো
কেবল ঈশ্বর কানা।।

সেই থেকে
আজো যুদ্ধ
থামল না আর থামল না।
কত আঘাত
তবু পাথর
ভাঙল না আর ভাঙল না।।

সেই যুদ্ধ
আজো চলে
দলিত অভিজাতে
কখনো বা
সমারোহে
কখন রক্তপাতে।।

৩০ ৩ ২০০৭, আগরতলা

পাহাড়ে লালফুল
(দশরথ দেবের প্রতি)

একজন মানুষ ছিলেন
যাঁর মুখ ছিল
সূর্যের প্রতিমা
চোখ ছিল রৌদ্রময়।
তিনি কথা বললে মনে হত
তিনি স্বপ্ন দেখেন
এবং বোঝেন
সমুদ্র অরণ্য পর্বতের ভাষা
পতিত মানুষের ক্রোধ
আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা
এবং স্বর্গজয়ের বাসনা।

তিনি একজন অবণ্য বালক
যেন আব একজন একলব্য
আমৃত্যু রয়ে গেলেন অবণ্যের পাশে
জুম চাষের গন্ধে
লেবাং মামিতা হজাগিরি গরিযার
নাচে গানে ময়দানে
বীজ থেকে বৃক্ষের গরিমায়
একদিন তিনি বনস্পতি হয়েছিলেন
ছায়াবৃত অবণ্যের মায়া
সেজন্য তাঁব নামে জারি হয়েছিল
হুলিয়া
কারাবাস

নিক্ষিপ্ত হয়েছিল গ্রেনেড
যেমন একলব্যের কাটা হয়েছিল আঙুল।

তিনি পাথরের কথা বুঝতেন
নদীর বিলাপ শুনতেন
জানতেন চোখের জল আগুন হয় কেন
দুখী মানুষের বুকে ঝড় কেন কথা বলে
সেই ঝড়কে জাগাবার জন্য
তিনি বলতেন, বর্ণমালা লিখ
অঙ্ক শিখ
নইলে বুঝবে না
মহাজন কেন মোটা হয়
কেন তোমার সোনার ফসলে
ব্যাপারীর গোলা ভরে।

তিনি বিদ্যালয় খুলে দিলেন
ছনের চালায় আর গাছতলায়
তিনি আগুন দিয়ে বানিয়ে দি[illegible]
জুমিয়ার মনে বেজে উঠল রণ[illegible]
বোবা মানুষ বলে উঠলো, তি[illegible]
আমরা রাজার গোল[illegible]
মধুতি কুমারী তিতুন[illegible]
রক্ত দিল
গোলাঘাঁটি ধান দি[illegible]
প্রাণ দিল।

তিনি যাদু জানতেন
বোবা পাহাড়কে শব্দ দিলেন

পাহাড়ের উলঙ্গ মানুষকে শিখালেন যুদ্ধ
হাতে দিলেন ধনুর্বাণ
কণ্ঠে দিলেন উচ্চারণ
অন্ন চাই বস্ত্র চাই
চাই উজ্জ্বল পরমায়ু, আর বর্ণমালা।

সহযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে
তিনি সকলকে বোঝালেন
শোষিতের কোনো জাত নেই
দুনিয়ার মজুর এক হও
দাসত্ব ছাড়া হারাবার কিছু নাই
জয়ের জন্য আছে জগৎ
পাহাড়ে-সমতলে গড়ে উঠলো সেতু
অক্ষয় ভালবাসার।

শত্রুরা বহুবার ভেঙেছে সেই সেতু
বীরের রক্ত স্রোতে ভরেছে নদী
অশ্রু জমে হয়েছে সাগর।

আজ তিনি নেই
তবু আছে আগুন
আর লেলিহান অরণ্য পর্বত
আছে অগণিত অগ্নিময় নিশান
একটি সূর্যের মুখ
আর সেদিকে হাঁটছে সর্বহারার
এক প্রলম্বিত মিছিল।

(সংক্ষেপিত)

সাত বোন

একটি মা
সাত কন্যা
সাতটি জ্বলে তারা।
একটি ফুল
একটি ফল
একটি জলের ধারা।।
একটি পাহাড়
একটি লোঙা
একটি নদী নদ।
হিমালয়েব
কন্যা তারা
শত্রু করে বধ।।
আজব দেশ
আজব কথা
আরো আজব মায়া।
নদীর পাড়ে
বৃক্ষ আছে
বৃক্ষ দেয় না ছায়া।।
নদীর ধারে
বনটি আছে
বনে ব্যাঘ্র রাজ।
সেই বাঘের
রক্ত জোগান
রাজার বেটার কাজ।।
মাটির নীচে
সোনার খনি
মাটির উপর না।
দিল্লী থেকে
দেওয়ান আসে
যেন বাঘের মা।।
একটি নদী
আঁকা বাঁকা
নদীর চরে ক্ষেত।
শস্য ফলায়
অন্ন ছড়ায়
(তবু) অশনি সংকেত।।

তাইতো আগুন
বুকে আগুন
জ্বলে একটি নদী।
নদীর ঘাটে
শিমুল বৃক্ষ —
কান্দে নিরবধি।।

গৌহাটি, ২৩. ৩. ২০০৭

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

সাত বোনের
একটি ভাই
ভাইয়ের নামটি দিল্লী।
বোনের প্রতি
নজর নাই
ভাইয়ের প্রিয় বিল্লী।।

বৃষ্টি পড়ে
টাপুর টুপুর
চোখের জলে পানি।
সেই পানিতে
আমরা ভাসি
গলায় বাঁধা ঘানি।।

রাজা রানী
কথার কলি
প্রজার জন্য কান্না।
রাস্তা ভাঙা
জমিনে জল
ভাত হয়নি রান্না।

সাদ্দাম

হঠাৎ কয়েকটি শৃগাল
চেঁচিয়ে উঠল
'সাদ্দাম ধৃত
ইরাক মুক্ত
পৃথিবী নিরাপদ।'

মার্কিনের বুশ
বৃটিশ ব্লেয়ার
জাতিসংঘের কোফি আন্নান
যেন বাঁচলেন!

একজন লোকের জন্যই
অন্ধকার নামছে চতুর্দিকে
গণতন্ত্র মৃত্যু পথযাত্রী
প্রগতি অবরুদ্ধ
তাই ভাঙা হল
সাদ্দামের প্রতিমা
বোমা নিক্ষিপ্ত হল হাসপাতালে
শিশুনিকেতনে বৃদ্ধাবাসেও।

সময় এখন কসাইখানার মত।
গতিহীন আর্তনাদে ভারি।
প্রতিবন্দীও ভয়ার্ত।
পৃথিবী নির্বাক।
বুদ্ধিজীবী কবিরা শান্ত।
জাতিসংঘ কাপুরুষদের রঙ্গশালা।

বাগ্মীরা গেছেন পানশালায়।
বারবণিতারা লাস্যময়ী সেবিকা।
হে সময়
তুমিও ঈশ্বরের মতই স্থবির !

জাতিসংঘের প্রেসিডেন্টের
ভাষণ শুনে মনে হল
পৃথিবী জুড়ে কমছে ঃ
লজ্জা। ইজ্জত। সততা। সাহস।

মার্কিনী হানার
ধ্বংসস্তূপে
লুকিয়ে ছিলেন সাদ্দাম
ইরাকের দুঃসাহসী দেশপ্রেম
সাদ্দাম ধৃত
সাদ্দামের ফাঁসি হবে।
ছবিতে দেখলাম।
বন্দী সাদ্দাম অবিচলিত
বুশ ব্লেয়ারের ঠোঁটে মৃদু হাসি
সাদ্দাম নির্বিকার
যেন আত্মঘাতী গেরিলা।

সাদ্দাম মৃত অথবা ধৃত
যাই হোক প্রভুগণ জেনে রেখো
এই মরুঝড় থামবে না কখনো
থামবে না সুইসাইড স্কোয়াড
ফাঁসিতে মরবে না স্বাধীন ইরাকি
ধরা পড়বে না বুশের মৃত্যু ফতোয়া
এবং ইরাকি দুঃসাহস।

১৫. ১২. ২০০৩

একুশ

একুশ মানে
ভোরের মিছিল
একুশ মানে ফাগুন।
একুশ মানে
কৃষ্ণচূড়ায়
জ্বলে রক্ত আগুন।।

একুশ মানে
কোকিল গাহে
শহীদ ভাইয়ের ডাক।
ভুবন জুড়ে
মাতৃভাষায়
উচ্চারিত বাক।।

একুশ মানে
রক্ত নদী
ভাষার শহীদান।
একুশ মানে
ঢাকা-শিলচর
বর্ণমালার গান।।

একুশ মানে
মাতৃভাষা
যেন মাতৃদুগ্ধ।
একুশ মানে
সকল ভাষায়
ফুল ফোটানোর যুদ্ধ।

একুশ মানে
পলাশ শিমুল
কৃষ্ণচূড়ার লাল।
এই তো একুশ
কুহু কুহু
শহীদ স্মৃতির কাল।।
একুশ মানে
দুরন্ত কাল
একুশ স্বাধীনতা।
একুশ দিলো
শহীদ মিনার
ঝড়ের উপকথা।।
একুশ মানে
ভালোবাসা
খোঁপায় গুচ্ছ ফুল।
একুশ মানে
সেই মেয়েটি
স্বপ্নে যে দেয় দোল।।
ঝড়ের দোল
পলাশ ফুল
আগুন লেলিহান।
একুশ মানে
বুকের ব্যথায়
কেবল কলতান।।
এবার একুশ
বিশ্বজুড়ে
প্রতিবাদের মুখ।
রণধ্বনি
জয়ধ্বনি
পলাশ শিমুল অশোক।।

ও কাবুলিওয়ালা

কাবুলের রাস্তায় আবার
খোলা বাতাস টোল খায়
অবরুদ্ধ রাজপথগুলি আবার খুলছে
বোরখাবিহীন নারীদের জন্য
কী হাল্কা লাগছে যৌবন
ঘাড় থেকে নামছে ভারী শিকল
ধর্মের বোঝা লাদেনের ফতোয়া।

সেলুনগুলিতে ভিড় দেখার মত
রৌদ্রের মত উজ্জ্বল যুবকেরা
পাথরের মত ভারী দাড়ির জঞ্জাল
নামাচ্ছে তাদের পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে
তরুণীরা প্রকাশ্যে খুলছে অবগুণ্ঠন
পুড়িয়ে দিচ্ছে ফরমান ঃ
আকাশ মলিন করার নির্দেশ
সূর্য নেভানোর পরামর্শ
মেঘে চাঁদ ঢাকবার আহ্বান।

কী হাল্কা লাগছে জীবন
এখানেই একদিন ধর্মীয় ষাঁড়ের পিঠে
রাষ্ট্রপতি নাজিবুল্লাকে বসিয়ে
বেত্রাঘাত করেছিল ঈশ্বরের পুত্রগণ
রাজধানীর রাস্তাগুলি শুধু
ধর্মেব ষাঁড়
ঐশ্বরিক কাফের

আর শয়তানদের জন্য খোলা ছিল
এখন খুলে গেছে নাগরিকদের জন্য
এখন ঝড় দোল খাচ্ছে প্রতিটি রাস্তায়।

আবার বাগদাদ বোখারা সমরকন্দ
সর্বত্র ওমর খৈয়ামের কবিতাব ফেনিল উচ্ছ্বাস
আবার কাবুলেব বিধ্বস্ত রাজপথে
বোমার ভগ্নাংশ আর চূর্ণ প্রাসাদেব কার্নিশে
উঁকি দিচ্ছে চাঁদ
রূপসী বমণীর খোঁপা থেকে
ঝরছে গোলাপের ঘ্রাণ
শরীর থেকে আসছে আতরের সুবাস
কী হাল্কা লাগছে তরুণীর মুখ।

নারীরা আবার ফিরে যাচ্ছে কাজে
আকাশবাণীতে পড়ছে খবর
পার্লারে গিয়ে রঙ মাখছে ঠোঁটে
নেমে পড়েছে রাস্তায়
ছিঁড়ে ফেলছে বোরখা
ডেকে বলছে মানি না
মানি না
মানি না
অন্ধকার শাসন।

মৃতদেহ আর ধ্বংসস্তূপ থেকে
উঠে আসছে শুধু নারীদের মুখ
আফগানিস্তান যেন হাজার বোরখা ছেঁড়া
নারীদের স্বাধীন মুখমণ্ডল শুধু

আর বোমা বিধ্বস্ত বাংকারে
পড়ে থাকা শয়তানের সশস্ত্র লাশ।

কাবুলের রাস্তায় আবার
দোল খায় বাতাস
দিনে মিষ্টি রোদ, রাতে জ্যোৎস্নায়
আবার কী ভাল লাগছে
কিশোর কিশোরীদের নাচানাচি
কাবুল আবার মেতে উঠছে
গোলাপের নেশায়।

হয়ত তখনই
রবি ঠাকুরের সেই ছোট্ট মিনি
আগডুম বাগডুম খেলতে খেলতেই ডাকবে
'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা'
আঙুর আখরোট গোলাপের দেশ
ভালবাসার প্রিয়ভূমি আফগানিস্তানের নাগরিক
হে রহমত, ও কাবুলিওয়ালা।

২৩. ১১. ২০০১, আগরতলা

অশ্বমেধের ঘোড়া

ছাদ ভেঙে পড়লো খাদে
মন্দির ভেঙে নালা
সারাদেশে আগুন জ্বেলে
মসজিদে রামপালা।
নাকের বদল নরুন কিনে
স্বাধীনতা পেলাম
রাম-রহিমে কুরুক্ষেত্র
কারবালাতে এলাম
হায়রে হাসান! হায়রে হোসেন!
হায় রামজী সীতা!
ভাই মরলো বোন মরলো
মায়ের বুকে চিতা!
ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের ছুরি
দেবতা হনুমান
এমন দেশটি কেমন দেশটি
নষ্ট শিবের গান
ভোটের জন্যে মাতাল রাজা
মন্দিরে মদ খান
আর নোটের জন্য পাগল রাজা
মসজিদে রোজ যান!

মসজিদ জ্বলে মন্দির জ্বলে
রাজা মশাই বক
এসব নিয়ে নিত্য নতুন
ভ্রাতৃঘাতী ছক!
এস হিন্দু এস মুসলিম
এস পরস্পর
এস বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টান
বাঁধ প্রেমের ঘর।।

বিহু

একদল যুবক-যুবতী তখন
ফুল হয়ে যায়
চাঁদ হয়ে যায়
উদ্দাম হাওয়ার দোল হয়ে যায়।।
ব্রহ্মপুত্রের জল
যেন ঢেউ খেলে যায়,
ঢেউ নেচে যায়
মনে হয় একদল রাজপুত্র
রাজকন্যা সাগর নাচায়!!
তখন যুবকেরা ডাকে
আয় আয়
যুবতীরা হাসে
না গো না।
কেমন যেন আকুলি
বিকুলি
উতল নদী
ঢেউ লাগে
চোখের পাতায় পাতায়।।
যুবক যুবতীরা তখন
নক্ষত্র হয়
পুলকিত যামিনীর
মাতাল কবিতা হয়।।
বসন্তের পাখী হয়ে
উড়ে যায়
উড়ে যায়
উড়ে যায়।।

যুবকেরা যুবতীরা
তখন
কাঁকনের শব্দে
মেঘমল্লার হয়
আকাশের মেঘ হয়
বৈশাখের ঝড় হয়
কঙ্কণ কিঙ্কিণী
গুরু গুরু গম্ভীরে
নাদ হয়
নাদ হয়।।

দীঘার ঘোড়া

সাগরবেলায়
দীঘার ঘোড়া
ঝলমলে তার সাজ।
ঝুমুর ঝুমুর
দে দোল চলে
যেন পক্ষীরাজ।।

ললাটভরা
মলমলি থান
গলায় মোহন মালা।
ঘোড়ার পিঠে
সিংহাসন
রেশমি চাদর আলা।।

সাগরজলের
জোয়ার ভাঁটা
দীঘার ঘোড়া ধায়।
পক্ষীরাজ
কদম কদম
বালুতে দৌড়ায়।।

ঘোড়ার পিঠে
খোকনসোনা
হস্তে তলোয়ার।
ঘোড়ার পিঠে
নতুন বউ
রঙিন সালোয়ার।।

ঘোড়া চড়ে
দাদু দিদা
কত হাসাহাসি।
ঘোড়ার পিঠে
জীবন বুঝি
ভালবাসাবাসি।।

দীঘার ঘোড়া
যুদ্ধে যায়না
বইতে গুলির বোঝা।
শিশুবোঝাই
দীঘার ঘোড়া
ছন্দে হাঁটে সোজা।।

সাগরজলে
জ্যোৎস্নাধারা
রূপে ঝিকমিক করে।
চাঁদের আলো
দীঘার ঘোড়ার
গায়ের ওপর ঝরে।।

দীঘার ঘোড়া
হাট্টিমাটিম
মুখে ফুলের জিন।
কান দুটি তার
খাড়া খাড়া
দেখতে যেন শিং।।

ফুলন

তোমরা আবার রক্তে ভিজিয়ে নাও
তরবারি
বন্দুক
পূর্বপুরুষের বল্লমগুলি।
মাল্লারা, হে বহিষ্কৃত জনমণ্ডলী
দখলদার উচ্চবর্ণ, পরজীবী
এবং লুটেরা প্রভুদের জাতের দুর্গগুলি
ভেঙে দাও
চুরমার কর
আর ধ্বংসস্তূপে নির্মাণ কর
নতুন বিধান —
কেউ খাবে কেউ পাবে না
না হবে না,
কেউ উচ্চবর্ণ কেউ বা নিম্ন —
এখন থেকে নিষিদ্ধ হল সর্বত্র
যারা মানতে রাজি নয়
তাদের প্রকাশ্যে দণ্ড দাও
মাল্লারা, হে বহিষ্কৃত জনমণ্ডলী
মরচে ধরা অস্ত্রে শান দাও আবাব
ফুলন ডাকছে তোমাদের!

ফুলন, হে নাগিনী কন্যা
হে দলিত রমণী
হে অনার্য দুহিতা

তুমি জন্মেছিলে — রানী হবার জন্যে
প্রেমিকা হতে প্রিয় বাহুডোরে
মাতা অথবা বধূ হবার জন্যে।
মনুর পুত্রগণ
কামান্ধ ঠাকুরেরা
বারবার নির্লজ্জ ধর্ষণে ছিন্ন ভিন্ন করে
তোমাকে পাঠাল চম্বলের অরণ্যে।
লোকালয়ে লজ্জা আড়াল করার জন্যে
সেদিন একখণ্ড বস্ত্র অথবা
একজন সৎ প্রতিবেশী ছিল না তোমার।
তুমি প্রতিশোধ নিতে দস্যু হয়েছিলে
সীতা সাবিত্রীরা কেঁদে কেঁদে পুণ্যবতী
হয়েছিলেন
তুমি অপরাধী ঠাকুরদের নির্মম মৃত্যুদণ্ড দিয়ে
হাজার সীতাকে ছাড়িয়ে গেলে।
দলিতেরা তোমায় দিল সালাম
ঠাকুরেরা তোমায় দিল মৃত্যুর ফতোয়া।

হে সহোদরা বোন আমার,
একদিন তুমি নরক থেকে উঠে এসেছিলে
এসেছিলে জঙ্গলের বিষাক্ত লতার মত
এসেছিলে মৃত্যুর গুহা থেকে
প্রলয়ের ফরমান নিয়ে ।
তারপর একদিন নিজেই
নতজানু হয়ে সমর্পিতা হলে
মানুষের কাছে, ভগবান বুদ্ধের পায়ে
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।
শান্তি মৈত্রী সৌভ্রাতৃত্বের কাছে এসেও

তুমি খুন হয়ে গেলে
ঘাতকদের হাতেই।

এবার মৃত্যু থেকে উঠে এসো আবার
প্রবলতর মৃত্যুদূত হয়ে
তুমি আবার রক্তে ভিজিয়ে নাও
তোমার পরিত্যক্ত তরবারি
বন্দুকের ট্রিগার
এবং পূর্বপুরুষের বল্লমগুলি।
হে বীর রমণী,
এবার তুমি
প্রলয়ের অগ্নিশিখা হও
জ্বলে ওঠো অন্তহীন দাবানলে
পুড়িয়ে দাও সমস্ত তমসার উৎস —
জাত পাত বর্ণ ও ধর্মবিকাব।
হে কৃষ্ণাঙ্গ ধর্ষিতা নাগিনী
তুমি আবার আলো হও
জ্যোতির্ময়ী হও।
তারপর বজ্র হও
ধ্বংস কর
বিনাশ কর
এই ধর্ষকাম সভ্যতাকে!!

দলিতেরা কেন জন্মায়

জন্তু জানোয়ারের মতই
বস্তির নরকগুলিতে আমরা জন্মাই
আর প্রতিবেশী বাবুদের বাড়ির
উচ্ছিষ্ট খেয়ে বড় হই।

শ্রম বিক্রি করে
বাসি রুটি কিনি
আমাদের উলঙ্গ ছেলেগুলি
শূয়রের মতই
নগরের ডাস্টবিন
আস্তাকুঁড়
এখানে ওখানে
কাদা মাটিতে
নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করে
বেড়ে ওঠে প্রতিদিন।

আমার মা রাস্তার মোড়ে
পাথর ভাঙেন
গরম পিচ ঢেলে
সড়ক বানান।
আমার বাপ বাবুদের বাড়িতে
ইঁট বালি সুরকি টানেন
মজুরির জন্য দরদাম করে
মাঝে মাঝে লাথি খান।

আমার বাবা-ই বলেন
এমন দু'একটা চড়ে
হারাবার কী আছে বেটা
একদিন তো
রাস্তাঘাটগুলি সব ছিল
বামুন ভদ্রদের জন্য
ওদের আসতে দেখলেই
আমরা সত্রাসে সরে পড়তাম
দূরে এক কোণে,
আমাদের গলায় বাজত ঘণ্টা
ঝুলত থুতু ফেলার ভাঁড়
কোমরে বাঁধা থাকত ঝাড়ু
কারণ আমরা দূষিত মানুষ
আমরা অস্পৃশ্য।

আমাদের দেখলেও
নষ্ট হত ব্রাহ্মণের শুভযাত্রা
স্পর্শে অপবিত্র হয় মন্দিরের সিঁড়ি
এদেশে একটু তৃষ্ণার জলের জন্য
আমাদের মারামারি করতে হয়
লড়তে হয় মরতে হয়
অথচ ওদের পবিত্র জলাশয়ে
গরু স্নান করে
কুকুর শিয়াল জল খায়
শুধু ঐ জল ছোঁয়া আমাদের জন্য নিষিদ্ধ।
আমাদের রমণীরা এখনো
সরকারী কূয়ার একটু জলের জন্য

দশঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন দশ হাত দূরে
বাড়াবাড়ি করলে
বর্ণহিন্দুরা লাথি মেরে
ভেঙে দেয় জলের কলসী
উলঙ্গ করে ঘোরায় রাস্তায়
কারণ আমরা নিম্নবর্ণ
কারণ আমরা এই গ্রহেব বিযাক্ত জীবাণু।
ঈশ্বর নাকি সকলেব
দুঃখ মুছে দেন
অথচ প্রভু গণেশের পায়ে
পুষ্পাঞ্জলি দিলে
আমাদের হাত কেটে নেয়া হয়।
ভোটের বাক্সে নাকি সকলেই সমান
সেখানেও আমাদের জন্য আলাদা লাইন
প্রতিবাদ করলে কেটে দেয় কান।
উপড়ে নেয় চোখ!
এই দেশ কি আমাদের?
এই দেশে দলিতেরা কেন জন্মায় ?
মাতৃভ্রূণে যদি নষ্ট হত তারা
তবে জন্মের এত অভিশাপ
সইতে হত না তাদের।

কেহ কেহ বলেন
এসব তো সেকেলে ব্যাপার
কেন পচা অতীত নিয়ে
আজকের সমতার বাতাসকে
নষ্ট করছেন আপনারা ?

আসলে কি তাই ?
আজো কি শূদ্রদের জন্য
আলাদা কাপ গ্লাস থাকে না
কোনো কোনো চায়ের দোকানে ?
এক টুকরো জমি
একটু মজুরি
তৎসহ একটু মানুষের মত মর্যাদা
এসব দাবি তুলতেই
বহুস্থানে আমাদের গলা কাটা হয়
জ্যান্ত পুঁতে দেয় মাটিতে।
আমরা প্রতিবাদ করি কেন ?
কেন জোরে কথা বলি ?
যে রাস্তায় জন্তু জানোয়ার চলে
সেই রাস্তাগুলিও তখন
আমাদের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যায়।
তখনই মনে হয়
আমরা কেন এই দেশে জন্মাই
এই দেশে জন্মানোই
আমাদের অপরাধ
কারণ আমরা দলিত
আমরা অস্পৃশ্য
আমরা মন্ত্রহীন
বহিষ্কৃত এবং ব্রাত্য!
এইসব দাসদাসী
সামাজিক ভৃত্যদের জন্য
একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ
বাবা সাহেব আম্বেদকর

একাই পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন
প্রতিবাদের
এক দ্রোহকালের
অমল প্রতিরোধে।
তিনি এদের জন্য
লিখে দিলেন একটি সংবিধান।
মানবাধিকারের একটি মহাসনদ
ঘোষিত হল ঃ
সমতা সকলের জন্য
অস্পৃশ্যতা অপরাধ
রাষ্ট্র ধর্ম্মমুক্ত।

সেই মানুষটি বলতেন,
অবদমিতেরা দাঁড়াও
অবনমিতেরা জাগো
সকলের মত সমান হও
হাত তুলে আকাশ ছোঁও।

এখন সেই মানুষটাই আক্রান্ত
মানবাধিকারের সনদগুলিতে আগুন
সংবিধান আর কবিতার স্বাধীনতা বিপন্ন
চারদিকে বর্ণবাদের নষ্ট বাতাস।

এখন চাই দৃঢ় উচ্চারণ
আগ্রাসী আঁধারকে
পুড়িয়ে দেবার অগ্নিশিখা।

তাই কবিতা তুমি অগ্নি হও
দগ্ধ কর মিথ্যার আকাশ,

চতুর্বর্ণের স্রষ্টা
ঈশ্বরের ভ্রষ্ট সিংহাসন।

বস্তির নরকে
নগরের বাইরে
বহিষ্কৃত অন্ধকারে
আজো যারা জন্মাও,
দলিত ও শোষিতেরা
তোমরা বজ্র হও
বিদীর্ণ কর
নীলবর্ণ শৃগালের রাজপাট।
তারপর দখল কর
জয় কর
মাটি সমুদ্র
এবং
অনন্ত আকাশ।

মান্দাই

রাঙা টুকটুক
ভাইটি আমার
বোনটি জবাফুল।
সোনামণি
কই গেলি তুই
কোথায় কানের দুল।।

কেউ হাসে না
কেউ কাঁদে না
মাটির নীচে লাশ!
রুদ্ধ সময়
আতঙ্কিত
রক্তে ভেজা ঘাস!!

ঘাসের ডগায়
ফুল ফুটেছে
স্মৃতি শোকে ভারি।

ঘুমাও মানিক
ঘুমাও মণি
আর দেবো না আড়ি।।

হরিজন

টাক ডুমা ডুম ডুম
ভাঙলো ওদেব ঘুম
হাড়ি মুচি ডোম ।।

কে ভাঙালো
কে জাগালো
মন্ত্র দিল কে ?

তাই তো ওবা
পদানত
যুদ্ধে নেমেছে।।

কাঁপছে অতীত
কাঁপছে পাথব
বিচাব সনাতন।।

দিন বদলেব
দিনেব খোঁজে
জাগছে **হরিজন**।।

ভালোবাসা

আমি যখন অনালোকে ছায়াচ্ছন্ন হই,
ডুবে যেতে থাকি গাঢ় বিষাদের শোকে
তুমি আসো রৌদ্রময় ফুলের ফাল্গুনে
কথা বলো নদীর শব্দের মতো কল্লোলে
হৃদয়ের কাছাকাছি
প্রেমে সংগ্রামে ও সখ্যে।

যেদিন দেখেছি রৌদ্রে
গাঢ় রক্তে লাল পতাকার ভিড়ে
ভেসে যাও উদ্দাম মেয়ে তুমি,
যেন কোন যুদ্ধগামী প্লেটুনের সেনা,
সেদিন জেনেছি —
আমাদের মতামত তোমার গভীরে
বাসা বেঁধে আছে
সেদিন বুঝেছি, জীবনের জন্য
পাশাপাশি যুদ্ধে যায় রঞ্জন ও নন্দিনী।

তুমি আমায় দুলতে দিও না নৈরাশ্যে,
মাঝে মাঝে রমণীর স্বপ্নের কোরকে
স্নিগ্ধ আলোর জয়ের ইচ্ছাকে আমাদের,
অমলিন আলোর স্রোতে উজ্জ্বলতা যেন।

ভালবাসা বুঝি মেঘমুক্ত আকাশের নীল,
আশ্বিনের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত নদী,

কিংবা কিষানের চোখে তাজা শস্যের সংবাদ,
তাই তোমার স্বপ্নে এত সতেজ থাকি প্রিয়া।

তোমার নিবিড় চোখে
আমার জন্য আলো রেখে দিয়ো,
তোমাব বুকে বেখে দিয়ো প্রেম,
ফুল ও ফসলের জন্যে
আমাদের সংগ্রামের জন্যে
রেখে দিয়ো আনন্দ উত্তাপ।

মহাপ্রয়াণ
(রোহিণী দাসের স্মরণে)

এক যে ছিলেন
রাজার রাজা
মাথায় টুপি লাল।
শাসিতেরা
শাসক হবে
আজ না হোক কাল।

তিনি জানতেন
তিনি কাঁদতেন
বুকে কান্নার নদী।
পাগড়ি পরে
রাজা হবেন
দিনটি আসে যদি।।
ছিল না ভাত
ছিল না ঘর
ছিল দুইটি হাত।
একটি হাতে
কালের বাঁশি
অন্যটি প্রভাত।।
রাত পোহালে
দিন মজুর
কাজ ফুরালে যোদ্ধা।
মিছিল মিটিং
জনসভায়
অসাধারণ বোদ্ধা।।

মিছিলে লাল
পরনে লাল
বুকে কাস্তে তারা।
লেনিন ভাইয়ের
ফুল বাগানে
থাকেন তিনি খাড়া।।
আপন বলতে
লাল ঝান্ডা
প্রেম বলতে পার্টি।
জীবন মরণ
সঁপে ছিলেন
বাকি রইল আর কি।
বন্ধুজনের
প্রাসাদ হল
কিংবা প্রমোশন।
দীনতাই তার
ভূষণ ছিল
পেটে অনশন।।

তবু তিনি
রোজ বলতেন
মজদুর হও এক।
গরীবেরা
স্বর্গ পাবে
আকাশের অর্দ্ধেক।।

এক যে ছিলেন
রাজপুত্র
কাঁটার মুকুট মাথে।
এক হাতে তার
ঝান্ডা ছিল
অসি অন্য হাতে।।

মিছিল জুড়ে
তিনি হাঁটতেন
নাচে যেন রুদ্র।
মজুর ছিলেন
যোদ্ধা ছিলেন
এবং ছিলেন শূদ্র।।

সেতু নিরবধি

পাহাড় ছিল
রাত্রি ভরা
আকাশ ছিল ম্লান।
কণ্ঠ ছিল
বুলেটবিদ্ধ
বুলবুলি খায় ধান।।

উলু উলু
ধান্য দূর্বা
আগুন দিল জয়।
মৃত্যু ভেদি
জাগল পাহাড়
পালিয়ে গেল ভয়।।

পাঠশালাটার
দরজা খুলে
ভোরে বাজে ঘণ্টা।
লক্ষ প্রাণে
হিরণ্যদিন
চঞ্চল হয় মনটা।।

আঁধার ছিল
রাত পোহালো
ফুটল কুসুম কলি।
পুঞ্জ পুঞ্জ
জয়ধ্বজা
গুঞ্জরিত অলি।।

পাহাড় পাহাড়
ফুটছে আলো
চম্প্রেং গায় গান।
ঝর্নাজলে
বনলতা
ছড়িয়ে দিল ঘ্রাণ।।

ফুলের ঘ্রাণ
ছড়ার তান
আঁকাবাঁকা নদী।
পাহাড় থেকে
সমতল
সেতু নিরবধি।।

দলিত ঃ বাতাসে পায়ের শব্দ

আমাদের চোখগুলি
আমাদের কালো চোখগুলি
আঁধারে অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বলে
আমাদের চামড়ায় নেই আভিজাত্যের বার্নিশ
বুকে আছে হাজার বছরের আগ্নেয় ফার্নেস
ক্রীতদাসরা আমাদের পূর্বপুরুষ।
ঘামে ও রক্তে আমাদের জন্ম।

এখন সর্বত্র আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে
আলোচনা, কানাকানি
চোখরাঙানি, ফিসফিস ষড়যন্ত্র
অথবা নিষ্ঠুর হানাহানি
অযথা রক্তপাত।

জমি খাদ্যগুদাম সরকারি অফিসের চেয়ার
কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দার অধিকার নিয়ে
মোটা মোটা শব্দে বিতর্ক।
নীলরক্ত আর নীলবর্ণ শৃগালের পুরাতন গল্প
ছড়াচ্ছে বাসি গন্ধ,
রাজনীতিতে যারা ফুলের আঘাতে মূর্ছায় রত
তাদের চোখগুলি এখন ঝরা ফুল,
মাটির আবদার যারা সইতে নারাজ
তারা কাগজে লিখছে বড় বড় নিবন্ধ
কে কোথায় শূদ্র জাগরণ নিয়ে
করে বৃথা আস্ফালন,
বন্যেরা বনে সুন্দর

চাকুরি ও চাকরের বৃথা তর্ক দেবগণ।
মণ্ডল কমিশনের বিতর্কে
চাকা বন্ধ, ইন্দ্রপ্রস্থ অগ্নিদগ্ধ
আর্যপুত্রগণ আত্মাহুতি কিংবা
বুট পালিশে নেমেছিলেন
পুড়িয়েছিলেন স্বর্গের কয়েকটি সিঁড়িও।
তবু প্রতিটি বন্দরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের ঘাটে
গুজরাট পাঞ্জাবে ডেকে গেছে বান,
হাজার বছর যে পাখি কেঁদেছে খাঁচায়
তার ডানায় লেগেছে সমুদ্র-বাতাস
পুরাতন বন্দরে নেশার ছড়াছড়ি,
নাবিক মাঝি মাল্লা ও যাত্রিগণ
তোলে পাল, ধরে হাল, ছেড়ে নোঙর
সে সময় আমাদের চোখগুলি জ্বলে
রাত্রির আকাশে নক্ষত্রের মতো।
এখন রাজনীতিতে মানুষ ধরার
সেইসব পুরনো কথাগুলি ভোঁতা হয়ে পড়ছে
আমরা বুঝতে পারি, আনুগত্য আর কর্তৃত্ব
হাতের কাজ ও মাথার কাজ নিয়েই
প্রথম বিতর্কে জন্ম নিল আইন,
শাস্ত্র ও পুরোহিতের বাণী, ব্রহ্মবিদ্যা
পুরোহিত ক্ষত্রিয় ও বণিকেরা
কেড়ে নিল রাজদণ্ড,
রাজা ঈশ্বরের ছায়া
তাই আমাদের দেয়া হল দাসত্ব।
সেইদিন থেকে ঘামের অগ্নিরেখায়
আমরা চিহ্নিত দাস দাসী

অস্পৃশ্য শূদ্র
কিংবা ব্রাত্যজন,
আমরাই আজকের মহিমান্বিত মজুর,
রাজদণ্ড আমাদের শেষ উত্তরাধিকার
কারণ আমাদের কোনো পূর্বপুরুষের হাত থেকেই
চুরি গেছে রাজদণ্ড।
বাতাসে আগুনের মতো পা ফেলে
আসছে দিন
অজস্র মাদলের শব্দে বাজে
রাজকীয় অভ্যুত্থান।
কারা আসে
ওরা আসে
আমরাই আসিতেছি
ঘামের সিলভারে সাজানো
আমাদের শিরস্ত্রাণ।
দেখুন তো,
বুকের ভিতর হাত রেখে
ইতিহাসের পাতায় চোখ রেখে দেখুন,
কারা আসে
বাতাসে পায়ের শব্দ
যেন সমুদ্রের ঝোড়ো শিস।

তুফান

একটি মেয়ে
কালো হরিণ
তুফান যেন ওড়ে।
সেই মেয়েটি
হীরের খনি
স্বর্গ মর্ত্য ঘোরে।।
ঘুমে ঘোবে
জেগে ঘোরে
জ্বলে সূর্যতাপে।
সেই মেয়েটিব
যাদুর স্পর্শে
মৃত মানুষ কাঁপে।।
অবাক মেয়ে
অবাক জয়ে
আর্যাবর্তের রানী।
রানীর হাতে
ছিন্ন শিকল
হাওযায় কানাকানি।।
একি হল
জাতটি গেল
গেল কুলমান।
পায়ের ধুলি
তিলক হলো
ভোটের ফরমান।।

গোপাল কা[illegible]
ঠাকুরঘরে
নদীর পাড়ে পুত।
কারে দিলাম
ক্ষীবননী
কারে দিলাম ভোট।।
খাজনা দিলাম
বাজনা দিলাম
দিলাম হাতির দাঁত।
আসন গেল
শাসন গেল
কোথায় রাখি জাত।।
অবাক মেয়ে
[illegible]
[illegible] মূক-জনে।
[illegible] বুকে
[illegible] টানে
[illegible] রণে।।

কালো মেয়ে
আলোর পাখি
আলোকবরণ চোখ।
দুই চোখে চন্দ্র সূর্য
[illegible] মূক।।

লেনিন

আকাশ জুড়ে
মেঘ ছিল
মেঘে ছিল আঁধার।
পেটের ভিতর
আগুন ছিল
বুকে শুকনো হাড়।।

কুলাক ছিল
জার ছিল
ছিল বেত্রাঘাত।
শীত প্রাসাদে
আরাম ছিল
হুকুম রক্তপাত।।

ক্ষুধার্ত দিন
শোকার্ত রাত
মৃত্যু প্রতিদিন।
লেনিন দিলেন
ইস্তেহার
বুলেট হাতে নিন।।

গ্রাম কাঁপল
শহর কাঁপল
কাঁপল নাবিক সেনা।
পটেমকিন
দাগল কামান
শুধতে রক্ত দেনা।।

একটি দেশ
একটি রাজ
বিশ্বজুড়ে খবর।
লেনিন দিলেন
ভল্গা তীরে
পুঁজিবাদকে কবর।।

চতুর্দিকে
হাজার শেয়াল
রুশবিরোধী হাঁক।
প্রতিক্রিয়ার
বিষ ছড়াল
মাছি লাখে লাখ।।

অবিরাম
যুদ্ধ তাই
যুদ্ধে ইলিচ লেনিন।
ডাইনে যুদ্ধ
বাঁয়ে যুদ্ধ
যুদ্ধ বিরামহীন।।

বিশ্বজুড়ে
আজো লেনিন
ঝড়ের মন্ত্রণায়।
সুখে লেনিন
বুকে লেনিন
লেনিন যন্ত্রণায়।।

নারী

শৈশবে সে
পিতার অধীন
যৌবনে সে পতির।
বৃদ্ধকালে
পুত্র মালিক
স্বাতন্ত্র্য নেই সতীর।।

নারী অতি
দুষ্ট মতি
শয়তানেরই দূত।
আদমকে দেয়
নিষিদ্ধ ফল
সমাজকে দেয় ভূত।।

কোনো গুণ
নাইকো তাহার
সারা দেহে বন্যা।
আকাশ জ্বালায়
বাতাস কাঁদায়
সে দোজখের কন্যা।।

মনুস্মৃতি
শরিয়ত আর
ধর্মশাস্ত্র যত।
নারীর পিঠে
পাথর রাখে
নিষেধ শতশত।।

ঘোমটা দিও
বোরখা পরো
পতির চিতায় মর্।
রান্নাঘরে
কান্না পেলে
নারীর গালে চড়।।

পণের জন্য
জতুগৃহে
নারী দগ্ধ হয়।
ভ্রূণে হত
জননীকুল
একী রে প্রলয়।।

তাইতো আজ
নারীরা সব
সাজে অগ্নিশিখা।
অর্ধ আকাশ
অর্ধ জমিন
নারীর জন্য লিখা।।

আঁধার থেকে
আসছে নারী
শাস্ত্র-আচার ভেদি।
পিতৃতন্ত্র
ভাঙছে নারী
জাগছে নরক ছেদি।।

সুকান্ত

এক যে ছিলেন
তরুণ কবি
শব্দে ছিল বারুদ।
অগ্নিকণা
প্রলয় শিখা
রক্তে প্রতিরোধ।।

বুকের ঘরে
লেনিন ছিলেন
মাথায় ঠাকুর রবি।
খাদ্য লাগি
কিউ দিতেন
দুর্ভিক্ষের কবি।।

তাঁর বসন্ত
পুষ্পিত নয়
নিঠুর বুলেট বিদ্ধ।
রক্ত দানের
পুণ্যে স্নাত
আত্মদানে ঋদ্ধ।।

মহাজনী পাপ
বণিকের লোভ
স্ফীত হইল কত।
জিজ্ঞাসে কবি
হিসাব দিবে কি
কত জন দুর্গত।।

চিতার আগুনে
জ্বালাইয়া দিয়ো
মৃত্যুর প্রতিশোধ।
স্বজন হারানো
শ্মশানে রাখিও
ক্ষমাহীন যত ক্রোধ।।

এক যে ছিলেন
তরুণ কবি
শব্দে ছিল হুংকার।
মন্ত্রে ছিল
মারণাস্ত্র
ধনুর্বাণের ঝংকার।।

তিনি আছেন
দীর্ঘজীবী
তিনি আছেন রণে।
অস্ত্র ধরান
রক্ত ঝরান
নিত্য প্রতিক্ষণে।।

নজরুল

কবি ছিলেন
পুষ্প সম
ফুটেছিল ফুল।
দখিন হাওয়ায়
উড়ত তুফান
মাথায় ঝাঁকড়া চুল।।
এক হাতে তাঁর
বিষের বাঁশি
অন্যহাতে শঙ্খ।
অগ্নিবীণা
বাজান তিনি
নির্ভীক নিঃশঙ্ক ।।
অগ্নিবীণায়
আগুন জ্বলে
দগ্ধ তিমির নিশা।
ধর্ম কারার
কপাট ভাঙে
ফোটে বুকের ভাষা।
দুখু মিয়ার
দুঃখ ছিল
দুঃখে জীবন গড়া।
জীবন প্রান্তেই
লেটোর দলে
কবি বেচতেন ছড়া।।

আজ ফৌজে
কাল খবরে
পরশু গেলেন জেলে।
দেশের জন্যি
যুদ্ধ করেন
একটি সোনার ছেলে।।
ত্রিশ কোটি মুখের ভাত
যারা করে গ্রাস।
কবি বলেন
রক্তে লিখো
তাদের সর্বনাশ।।
মুসলিম তার
নয়নমণি
হিন্দু তাহার প্রাণ।
একটি আকাশ
বৃষ্টি ঢালে
একটি কলতান।।

কবি ছিলেন
ফুলের মতন
ফুটেছিল ফুল।
ফুলের গন্ধে
আগুন ছিল
কবি নজরুল।

তুমি জাগাও

(অদ্বৈত মল্লবর্মনের প্রতি)

তোমার শরীরের সেই ঘাতক জীবাণুগুলি
এখনো বাতাসে শ্বাস ফেলে
মৃত্তিকার কোষে জলধারায়
শুষে খায় অনন্ত যৌবন।
হে স্রষ্টা, তুমি আমাদের অমৃত দাও
রক্তে দাও উত্তরাধিকার
হাতে দাও তিতাসের জলধাবা
আমরা তো জয়ী হতে চাই
মাটি ও জীবনের তমসুকে দখল দাও
সেই জলের নীচে রুপালি মাছেব গন্ধ
বাঁশির ডাকে যুবতী নারীর ভাঙা হৃদয়
তিতাসের অন্তহীন জলের মতন
আমাদের হৃদয জাগাও।

•

মালোপাড়ায় এখনো গভীর বাতে
তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা গুমরায়
তাদের কান্নার শব্দে রাত্রির ঘুম ভাঙে বোজ।
সেই জলের শব্দ, জলের গভীরে চিতলেব ডিম
তোমার অনুজ্জ্বল স্মৃতি, ঝাপসা মুখমালা
স্বজনের ক্ষুধার্ত আর্তনাদ এবং তুমি
— তিতাস শতাব্দীর নির্দয় কাহিনী।

হে কবি, তুমি আমাদের জল দাও
আমরা আজীবন তৃষ্ণার্ত
আমাদের জাগাও
আমরা যে মরে আছি গাঢ় নিদ্রায়
ডেকে বলো, এখন প্রভাত কাল
তিতাসের ভোরবেলা, জেগে দেখো —
জলে ভাসে ডিঙি নাও, রুপালি রোদের নেশা।

যৌবন

যৌবন তুমি
আগুন হও।
লাল পলাশের
ফাগুন হও।।

সামনে দিন
রক্তঝরা।
গণতন্ত্রের
মৃত্যুকারা।।

প্রজাতন্ত্রের
বধ্যভুমি ।
জাগো যৌবন
মৃত্যু চুমি।।

জীবন মৃত্যু
পদতলে।
যৌবন শুধু
মাথা তোলে।

যৌবন তুমি
পবন হও।
শহীদ মায়ের
শ্রাবণ হও।।

গগন তুমি
যৌবন হও।
সূর্যোদয়ের
পবন হও।।

দুঃশাসনের
দুঃসহ রাত।
ছিন্ন করুক
লক্ষ হাত।।
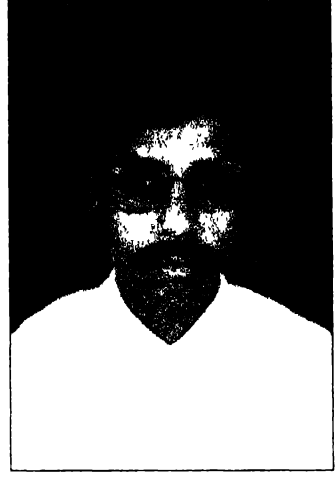
সম্পাদক গোপালমণি দাসের জন্ম ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫৩ সালে বিশালগড়েব অন্তর্গত ব্রজপুর গ্রামে। শিক্ষা ঃ ব্রজপুব প্রাথমিক বিদ্যালয়, চড়িলাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এম বি বি কলেজ থেকে বাংলায সাম্মানিক স্নাতক, স্নাতকোত্তব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এড এবং পি এইচ ডি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয থেকে। সোনামুড়া কলেজে অধ্যাপনা কর্মের সূত্রপাত, পববর্তীকালে বামঠাকুব কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান ও রীডাব, বর্তমানে অমবপুব কলেজের অধ্যক্ষ। ভাবতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি, ত্রিপুবা বাজ্য কমিটির সভাপতি।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তব বাংলা ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ।

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ দলিত সাহিত্য, দলিত সাহিত্য কবিতা সংকলন সেতু, অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মাবক গ্রন্থ, অনিল সরকার প্রভৃতি।